ফয়যানে মদীনা

অক্টোবর ২০২৬

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল মদীনা

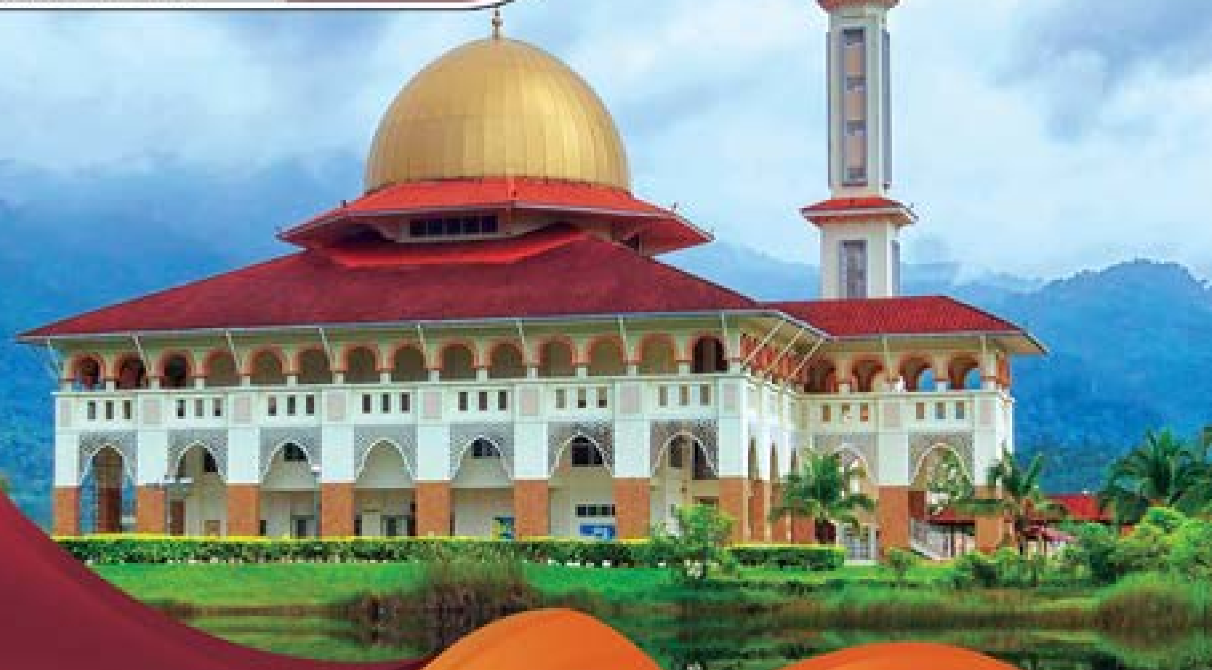

- পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়ন এবং খতমে নবুওয়াত আকিদা
- মুসলমানের জন্য সুপারিশ
- সর্বশেষ নবী মুহাম্মদে আরবী صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم এর খাটের ধরণ
- হারিয়ে যাওয়া দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল
- হযরত সায়্যিদুনা আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ رضی اللہ عنہ
- ছেলেদেরকে সময়মতো ঘুমানো ও জাগ্রত হওয়ার শিক্ষা দিন

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া
Islamic Research Center

ফয়যানে মদীনা

অক্টোবর ২০২৬

উপস্থাপনায় :
অনুবাদ বিভাগ
দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রকাশনায় :
মাকতাবাতুল মদীনা
দা'ওয়াতে ইসলামী

মাদানী চ্যানেল বাংলা
দেখতে থাকুন

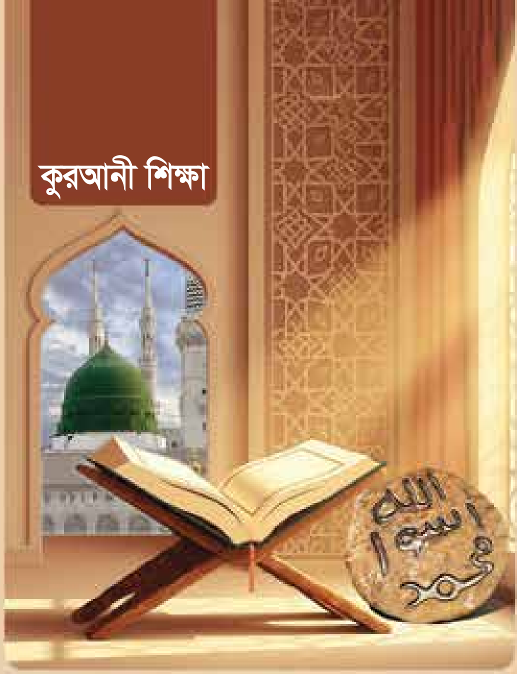

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়ন এবং খতমে নবুওয়াত আকিদা

মাওলানা আবুন নূর রাশিদ আলী আত্তারী মাদানী

আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমকে একাধিক স্থানে পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহের "মুসাদ্দিক" তথা সত্যায়নকারী হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই নির্দেশ কখনো “مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ”, কখনো “مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ/مَعَهُمْ” আবার কখনো “تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ” হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। বাহ্যিকভাবে এই শব্দগুলো কেবল এটিই প্রকাশ করে যে, কুরআনুল কারীম পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থনকারী; কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এই শব্দগুলো মূলত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির দিকে ইশারা করে। তা হলো; আসমানি ওহীর একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা বিদ্যমান ছিল, যেখানে প্রতিটি কিতাব তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ঐশী বার্তার উল্লেখ করে। পূর্ববর্তী সকল কিতাবই শেষ নবী মুহাম্মদ আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর আগমনের সংবাদ প্রদান করেছিল কিন্তু কুরআনুল করীম যা সত্যের এক অকাট্য প্রমাণ তা কেবল নিজের পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়ন করেছে; নিজের পরে অন্য কোনো ঐশী বার্তা, কিতাব বা নবী আসার ব্যাপারে অথবা তাঁদের সত্যায়ন করার ব্যাপারে কিছুই উল্লেখ করেনি। এটিই হলো এক অত্যন্ত স্পষ্ট এবং অকাট্য দলিল যে, বিশ্বজাহানের জন্য রবের পক্ষ থেকে এটিই সর্বশেষ পয়গাম।

আসুন, নিচে “পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী হিসেবে কুরআন এবং খতমে নবুওয়াত আকিদা” সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা লক্ষ করি:

কুরআনুল কারীমের পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের ওপর রক্ষক হওয়া

﴿وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ এবং হে মাহবুব! আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর সমর্থকরূপে এবং সেগুলোর সংরক্ষক ও সাক্ষীরূপে। সুতরাং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে ফায়সালা করুন। (পারাঃ ৬, আল-মায়িদাহঃ ৪৮)

ব্যাখ্যাঃ "মুসাদ্দিক" (مُصَدِّقًا) শব্দের অর্থ হলো; পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মূল ও প্রকৃত বিষয়বস্তুর সত্যায়ন করা। আর "মুহাইমিন" (مُهَيْمِنًا) অর্থ হলো; রক্ষক। অর্থাৎ কুরআনুল কারীম কেবল পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থনই করে না, বরং সেগুলোর ওপর চূড়ান্ত ফয়সালাকারী হিসেবে অবস্থান করে যে, পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর মধ্যে কোনটি সত্য আর কোনটি বিকৃত ও বাতিল। এটি সেই মর্যাদা, যা কেবল একটি চূড়ান্ত ও অকাট্য দলিলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়, যার পর আর কোনো দলিলের প্রয়োজন থাকে না। আর এই রক্ষণাবেক্ষণের মর্যাদা তখনই পূর্ণাঙ্গ অর্থ বহন করে, যখন কুরআনুল কারীম এই ধারার সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাব হিসেবে স্বীকৃত হয়। কুরআনের পর যদি অন্য কোনো ওহী নাযিল হওয়ার দাবিকে মেনে নেওয়া হয়, তবে তা কুরআনুল কারীমের এই মর্যাদার পরিপন্থী এবং কুরআনের এই নির্দেশের অস্বীকার হবে। এই আয়াতটি রিসালত, নবুওয়াত এবং ওহী সবকিছুর পরিসমাপ্তির ওপর এক বলিষ্ঠ দলিল।

"পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী হিসেবে কুরআন" সংক্রান্ত আরও কিছু আয়াতঃ

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী হওয়ার বিষয়টি কুরআনের অনেক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, যেমন সূরা আলে ইমরানে আছেঃ

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ তিনি আপনার উপর এ সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, পূর্ববর্তী কিতাবাদীর সমর্থনকারী এবং তিনি এর পূর্বে তাওরাত ও ইঞ্জিল অবতীর্ণ করেছেন ।

(পারাঃ ৩, আলে ইমরানঃ ৩)

সূরা আনআমে আছেঃ

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ
وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ؕ

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ এবং এটা বরকতময় কিতাব, যা আমি অবতারণ করেছি, প্রত্যায়ন করছে ঐসব কিতাবের যেগুলো পূর্বে ছিল, এবং এ জন্য যে, আপনি সতর্ক করবেন 'সমস্ত বস্তির সর্দার'কে এবং তাকে যে সমগ্র জাহানে সেটার চতুষ্পার্শ্বে রয়েছে।

(পারাঃ ৭, আল-আনআমঃ ৯২)

সূরা ফাতিরে আছেঃ

وَالَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ؕ

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ এবং ঐ কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি, তাই সত্য, নিজের পূর্ববর্তী কিতাবাদির সত্যতা ঘোষণা করে। (পারাঃ ২২, ফাতিরঃ ৩১)

সূরা বাকারায় আছেঃ

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ
بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى
لِلْمُؤْمِنِيْنَ (۹۷)

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ (হে হাবীব!) আপনি বলে দিন, 'যে কেউ জিবরাঈলের শত্রু হয়, তবে সে (জিবরাঈল) তো আপনার হৃদয়ের উপর আল্লাহর নির্দেশে এ কুরআন নাযিল করেছেন, পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর সত্যায়নকারী হিসেবে এবং সঠিক পথ-প্রদর্শন ও সুসংবাদ (হিসেবে) মুসলমানদের জন্য। (পারাঃ ১, আল-বাকারাহঃ ৯৭)

আল্লাহ পাক অনেক স্থানে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন যে, যেহেতু এই কুরআন তাদের নিজেদের কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী, তাই এর ওপর ঈমান আনা তাদের জন্য অত্যন্ত জরুরী ও আবশ্যক। আর যারা অস্বীকার করবেন, তাঁরা মূলত নিজেদের বিপক্ষেই দলিল কায়েম করছেন।

সূরা বাকারায় ইরশাদ হয়েছেঃ

﴿وَاٰمِنُوْا بِمَاۤ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ এবং তোমরা ঈমান আনো সেটার উপর যা আমি অবতীর্ণ করেছি সেটারই সমর্থকরূপে যা তোমাদের সাথে আছে।
(পারাঃ ১, আল-বাকারাহঃ ৪১)

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ আর যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই কিতাব এল যা তাদের কাছে (বিদ্যমান) কিতাবের সত্যায়নকারী। (পারাঃ ১, আল-বাকারাহঃ ৮৯)

وَاِذَا قِیْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَاۤ اُنْزِلَ عَلَیْنَا وَ یَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗۗ-وَ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْؕ-

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহর নাযিলকৃতের (কিতাব) উপর ঈমান আনো, তখন বলে, 'যা আমাদের উপর নাযিল হয়েছে, আমরা তার উপর ঈমান রাখি;' এবং বাকীগুলোকে তারা অস্বীকার করে; অথচ তা সত্য, তাদের নিকট যা আছে তার সত্যায়ন করে। (পারাঃ ১, আল-বাকারাহঃ ৯১)

সূরা নিসায় আছেঃ

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰۤى اَدْبَارِهَاۤ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّاۤ اَصْحٰبَ السَّبْتِؕ وَ كَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿۴۷﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ হে কিতাবীগণ! ঈমান আনো সেটার উপর যা আমি অবতরণ করেছি তোমাদের সঙ্গের কিতাব এর সত্যায়নকারীরূপে এর পূর্বে যে, আমি বিকৃত করে দেবো কিছু চেহারাকে; অতঃপর সেগুলো ঘুরিয়ে দেবো সেগুলোর পিঠের দিকে, অথবা তাদেরকে অভিসম্পাত করেছি শনিবার পালনকারীদেরকে এবং খোদার নির্দেশ কার্যকরী হয়েই থাকে।
(পারাঃ ৫, আল-নিসাঃ ৪৭)

পূর্ববর্তী ঘটনাবলীর বর্ণনা এবং সেগুলোর সত্যায়ন

কুরআনুল করীমে পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামের ঘটনাসমূহ (যেমন হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর ঘটনা) এমন বিস্তারিত এবং নির্ভুলভাবে বর্ণনা করেছে যা কোনো উম্মি নবীর পক্ষে জাগতিক মাধ্যম ব্যবহার করে জানা সম্ভব ছিল না। এটি নিজেই সত্যায়নের একটি রূপ যা মুহাম্মদী নবুওয়াতের ওপর দলিল প্রদান করে এবং এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী কিতাবগুলোরই সত্যায়ন করা হচ্ছে:

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ এবং এ কুরআনের ক্ষেত্রে এ কথা শোভা পায় না যে, সেটাকে কেউ নিজ পক্ষ থেকে রচনা করে নেবে, আল্লাহ এর অবতারণ করা ব্যতীত; হ্যাঁ, সেটা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়ন এবং লাওহ-এর মধ্যে যা কিছু লেখা আছে সব কিছুরই বিশদ ব্যাখ্যা; সেটাতে কোন সন্দেহ নেই যে, (সেটা) প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। (পারা: ১১, ইউনুস: ৩৭)

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ؕ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ নিশ্চয়, তাদের খবরাদি দ্বারা বিবেকবানদের চক্ষু খুলে যায়। এটা কোন বানোয়াট কথা নয় ; কিন্তু নিজের পূর্ববর্তী বাণীগুলোর সত্যায়ন এবং প্রত্যেক বস্তুর বিশদ বিবরণ আর মুসলমানদের জন্য হিদায়াত ও রহমত। (পারা: ১৩, ইউসুফ: ১১১)

وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰۤى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ؕ وَهٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ وَبُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ এবং এর পূর্বে রয়েছে মূসার কিতাব। পেশোয়া ও অনুগ্রহ স্বরূপ এবং এ কিতাব সত্যায়নকারী, আরবী ভাষায়, যাতে জালিমদেরকে সতর্ক করে, এবং সৎকর্মপরায়ণদের জন্য সুসংবাদ।

(পারা: ২৬, আল-আহকাফ: ১২)

ব্যাখ্যাঃ পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর সত্যায়নকারী হওয়ার বিষয়টি বারবার উল্লেখ করা এটিই স্পষ্ট করে যে, এখন কেবল এই চূড়ান্ত কিতাবটিই কার্যকর যা সর্বশেষ পয়গম্বরের ওপর নাযিল হয়েছে। যদি তর্কের খাতিরে ভবিষ্যতে নতুন কোনো নবী আসার সুযোগ থাকত, তবে একই শৈলী (যেমনঃ অমুক কিতাব অমুককে সত্যায়ন করে, অতএব ঈমান আনো) কুরআনের পরেও পুনরায় উচ্চারিত হওয়া জরুরী ছিল কিন্তু কুরআনুল কারীমের কোথাও এমন কোনো আয়াত নেই যা কুরআনের পর ভবিষ্যতে অন্য কোনো কিতাব বা নবীর মাধ্যমে স্বয়ং কুরআনের সত্যায়ন করা হবে এমন খবর প্রদান করে।

জ্বিন জাতিও সত্যায়নের কথা বলেছে

কুরআনুল করীমের সত্যায়নকারী মর্যাদা সম্পর্কে জ্বিন জাতিও নিজ সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বলেছিল:

قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْۤ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ তারা বললো, 'হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা একটা কিতাব শুনেছি যা মূসার পরে অবতীর্ণ হয়েছে, পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর সমর্থকরূপে, সত্য ও সরল পথ প্রদর্শক রূপে। (পারা: ২৬, আল-আহকাফ: ৩০)

জ্বিনরা কুরআনকে তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং সত্য ও সঠিক পথের দিশারী কিতাব হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। এই ঘটনা সূরা জ্বিনেও বর্ণিত হয়েছে যেখানে জ্বিনদের একটি দল মুসলমান হয়ে যায়। এ থেকে এটি আরও স্পষ্ট হয় যে, কুরআনের সত্যায়নকারী ও হিদায়েতকারী মর্যাদা সমগ্র মহাবিশ্বের সকল সৃষ্টি (মানুষ ও জ্বিন)-এর জন্য সর্বশেষ এবং যথেষ্ট। যখন জ্বিন ও মানুষ উভয়ের জন্য একটিমাত্র সত্য কিতাব ও একজন রাসূল যথেষ্ট বলে গণ্য হয়েছেন, তখন এরপর আর অন্য কোনো নবী বা কিতাবের মাধ্যমে পথপ্রদর্শনের প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে না।

কুরআনুল কারীম এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নের মধ্যে পার্থক্য

উপরোল্লিখিত শেষ দুটি আয়াত আমাদের জানায় যে, কুরআনের আগে মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর ওপর "তাওরাত" হিদায়েতের জন্য এসেছিল। যখন আগের কিতাব এবং পূর্ববর্তী আম্বিয়াদের কথা বলা হচ্ছে, তখন পরেও যদি কেউ আসতেন তবে তাঁদের কথাও উল্লেখ করা যেত। কিন্তু যেহেতু কুরআন সর্বশেষ ওহী এবং রাসূলে মুকাররম সর্বশেষ নবী, তাই পরবর্তী কারো আসার কোনো সুযোগই নেই।

কেউ হয়তো আপত্তি করতে পারেন যে, আগের কিতাবগুলোও তো তাদের আগের কিতাবগুলোর সত্যায়ন করেছে, কুরআনও তার আগের গুলোর সত্যায়ন করেছে, তবে পার্থক্য কী হলো? মনে রাখবেন; আগের কিতাব এবং আম্বিয়ায়ে কেরাম যেমন তাঁদের পূর্ববর্তী আম্বিয়া ও কিতাবসমূহের সত্যায়ন করেছেন, তেমনি তাঁরা তাঁদের পরে আগমনকারী শেষ নবী মুহাম্মদ আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুসংবাদও প্রদান করেছেন। কিন্তু কুরআনুল কারীম এবং রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদের পর আর কেউ আসার কোনো সংবাদ দেননি।

ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়ন এবং হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর আগমনের সংবাদ দিয়েছেন

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗۤ اَحْمَدُ-فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ এবং স্মরণ করুন! যখন মারয়াম-তনয় ঈসা বললো, 'হে বনী ইস্রাঈল! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ এরই

রসূল, আমার পূর্বেকার কিতাব তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং এ (সম্মানিত) রসূলের সুসংবাদদাতা হয়ে, যিনি আমার পরে তাশরীফ আনবেন, তার নাম 'আহমাদ। অতঃপর যখন আহমাদ তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে তাশরীফ আনলেন, তখন তারা বললো, 'এতো সুস্পষ্ট যাদু। (পারা: ২৮, আস-সাফ্ফ: ৬)

ইহুদি ও খ্রিস্টানরা পূর্ববর্তী কিতাব ও নবীদের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর আগমন সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিল

اَلَّذِیْنَ اٰتَیْنٰهُمُ الْكِتٰبَ یَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا یَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ-وَاِنَّ فَرِیْقًا مِّنْهُمْ لَیَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ یَعْلَمُوْنَ

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি তারা এ নবীকে এমনিভাবে চিনে যেমন মানুষ তার পুত্র-সন্তানদের চিনে এবং নিশ্চয়ই তাদের একটা দল জেনে বুঝে সত্য গোপন করে। (পারা: ২, আল-বাকারাহঃ ১৪৬)

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ- وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ یَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِیْنَ كَفَرُوْا -فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ-فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِیْنَ

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ এবং যখন তাদের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার সেই কিতাব (কুরআন মাজীদ) এসেছে, যা তাদের সাথে রয়েছে এমন কিতাব (তাওরাত)-এর সত্যায়ন করে এবং এর পূর্বে তারা সেই নবীর 'ওসিলা' ধরে কাফিরদের উপর বিজয় প্রার্থনা করতো, অতঃপর যখন তাশরীফ এনেছেন তাদের নিকট সেই পরিচিত সত্তা, তখন তাঁকে অস্বীকারকারী হয়ে বসেছে। অতএব, আল্লাহর লা'নত (অভিশাপ) অস্বীকারকারীদের উপর। (পারা: ১, আল-বাকারাহঃ ৮৯)

সত্যায়নকারী রাসূল

কুরআনুল কারীম যেমন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী, তেমনি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী:

وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِیْقٌ مِّنَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ -كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ এবং যখন তাদের নিকট তাশরীফ আনলেন আল্লাহর নিকট থেকে একজন রাসূল, তাদের কিতাবগুলোর সমর্থকরূপে তখন কিতাবীদের একটা দল আল্লাহর কিতাবকে তাদের পৃষ্ঠে-পেছনে নিক্ষেপ করেছে, যেন তারা কোন জ্ঞানই রাখেনা। (পারা: ১, আল-বাকারাহঃ ১০১)

ব্যাখ্যাঃ এখানে "মুসাদ্দিক" (مُصَدِّقٌ) শব্দটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর পবিত্র সত্তার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, কেবল কুরআনের জন্য নয়। অর্থাৎ আপনার রিসালত স্বয়ং পূর্ববর্তী ওহীর সত্যায়ন। তা সত্ত্বেও একটি দল জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর কিতাবকে উপেক্ষা করেছে। মুহাম্মদ ফারুক আল-জাইন লিখেছেন যে, ইহুদিদের নিজেদের কিতাবেই (সফরে তাসনিয়ায়

১৮: ১৮) এটি স্পষ্ট ছিল যে, প্রতীক্ষিত নবী ইসমাঈল عَلَيۡهِ السَّلَام এর বংশধর থেকেই হবেন।

وَاِذۡ اَخَذَ اللّٰهُ مِيۡثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَاۤ اٰتَيۡتُكُمۡ مِّنۡ كِتٰبٍ وَّحِكۡمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمۡ رَسُوۡلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمۡ لَتُؤۡمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنۡصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقۡرَرۡتُمۡ وَاَخَذۡتُمۡ عَلٰى ذٰلِكُمۡ اِصۡرِىۡ ؕ قَالُوۡۤا اَقۡرَرۡنَا ؕ قَالَ فَاشۡهَدُوۡا وَاَنَا مَعَكُمۡ مِّنَ الشّٰهِدِيۡنَ ﴿۸۱﴾ فَمَنۡ تَوَلّٰى بَعۡدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الۡفٰسِقُوۡنَ ﴿۸۲﴾ اَفَغَيۡرَ دِيۡنِ اللّٰهِ يَبۡغُوۡنَ وَلَهٗۤ اَسۡلَمَ مَنۡ فِى السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ طَوۡعًا وَّكَرۡهًا وَّاِلَيۡهِ يُرۡجَعُوۡنَ ﴿۸۳﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং স্মরণ করুন! যখন আল্লাহ্ নবীগণের নিকট থেকে তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, 'আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হিকমত প্রদান করবো, অতঃপর তাশরীফ আনবেন তোমাদের নিকট রসূল, যিনি তোমাদের কিতাবগুলোর সত্যায়ন করবেন, তখন তোমরা নিশ্চয় নিশ্চয় তাঁকে সাহায্য করবে। ইরশাদ করলেন, 'তোমরা কি অঙ্গীকার স্বীকার করলে এবং এ সম্পর্কে আমার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করলে?' সবাই আরয করলেন, 'আমরা স্বীকার করলাম।' ইরশাদ করলেন, 'তবে (তোমরা) একে অপরের উপর সাক্ষী হয়ে যাও এবং আমি নিজেই তোমাদের সাথে সাক্ষীদের মধ্যে রইলাম।' সুতরাং যে কেউ এর পর ফিরে যাবে তবে সেসব লোক ফাসিক্ব তবে কি (তারা) আল্লাহর দ্বীন ব্যতীত অন্য দ্বীন চায়? এবং তাঁরই সম্মুখে গর্দান অবনত করেছে যে কেউ আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে স্বেচ্ছায় ও বাধ্য হয়ে এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

(পারা: ৩, আলে ইমরান: ৮১-৮৩)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ পাক সকল আম্বিয়া ও রাসূলদের কাছ থেকে যাঁর আগমনের ওপর তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা করার অঙ্গীকার নিয়েছেন, এবং এই অঙ্গীকারের ওপর সুদৃঢ় স্বীকারোক্তি নিয়েছেন, দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, সাক্ষী বানিয়েছেন এবং নিজেও সাক্ষী থেকেছেন সেই নবী কেবল এবং কেবলমাত্র মুহাম্মদ আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। তাঁর ব্যাপারে এত মজবুত অঙ্গীকার নেওয়া এটিই স্পষ্ট করে যে, যখন তিনি তাশরীফ আনবেন, তখন তিনিই হবেন সর্বশেষ নবী। যদি তাঁর পরে অন্য কোনো নবী আসার সম্ভাবনা থাকত এবং তিনি যদি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর অনুসারী হিসেবে আসার সুযোগও থাকত, তবে আম্বিয়াদের কাছ থেকে এই অঙ্গীকারও নেওয়া হতো যে, আপনার পরেও যারাই আসবে তাদের দ্বীনকেও আঁকড়ে ধরবে। কিন্তু না, আল্লাহ পাক এমন কোনো অঙ্গীকার নেননি।

এই অঙ্গীকার না নেওয়াটিও এটিই প্রমাণ করে যে, রাসূলে মুকাররম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর পর নতুন কোনো নবী আসার ছিল না। যেমন কাদিয়ানীরা তাদের ভণ্ড মির্জা কাদিয়ানীর ব্যাপারে দাবি করে যে, সে নাকি রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এরই শরীয়ত ও দ্বীনকে শক্তিশালী ও প্রচার করার জন্য নবী হয়ে

এসেছে এটি নিরেট মিথ্যা, বাতিল, ফাসাদি দাবি এবং নিশ্চিত মুরতাদ ও কুফরি কাজ।

আল্লাহ পাক তো এই 'মিছাক' বা অঙ্গীকারের পর পরিষ্কার ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, যে এই অঙ্গীকারের বিরোধিতা করবে সে ফাসিক এবং এমন ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীন থেকে বিচ্যুত। আর যে আল্লাহর দ্বীন ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন চায় সে কাফের ও মুরতাদ।

উপরে উল্লেখিত আয়াতসমূহকে একত্রিত করে দেখলে এক অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুসংগত ফলাফল সামনে আসে:

তাওরাত নাযিল হয়েছে, এরপর ইনজিল তাওরাতের "মুসাদ্দিক" (সত্যায়নকারী) হয়ে এসেছে এবং স্বয়ং ইনজিল তার পরে একজন রাসূল (আহমদ)-এর আগমনের খবরও দিয়েছে। এই ধারা যখন কুরআনে পৌঁছাল, তখন কুরআনকে সকল পূর্ববর্তী কিতাবের "মুসাদ্দিক" এবং সেগুলোর ওপর "মুহাইমিন" অর্থাৎ চূড়ান্ত অভিভাবক ঘোষণা করা হলো। পাশাপাশি কুরআনুল করীমের কোথাও, কোনো একটি আয়াতেও এই খবর দেওয়া হয়নি যে, ভবিষ্যতে অন্য কোনো কিতাব এসে কুরআনের সত্যায়ন করবে অথচ তাওরাত ও ইনজিল উভয়টির ব্যাপারে স্বয়ং কুরআনই বলেছে যে, সেগুলোর পরে অন্য কিতাব আসার কথা ছিল।

হাদীসের ব্যাখ্যা

মুসলমানের জন্য সুপারিশ

মাওলানা ইজায নাওয়ায আত্তারী মাদানী

হযরত সায়্যিদুনা আবু মুসা আশআরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ اَقْبَلَ عَلٰى جُلَسَائِهِ فَقَالَ اشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا وَيَقْضِي اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا اَحَبَّ۔

অর্থাৎ, যখন কোনো অভাবী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর দরবারে আসতেন, তখন তিনি তাঁর পাশে বসা সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان -এর দিকে মুখ ফিরিয়ে ইরশাদ করতেন: হে লোকসকল তোমরা সুপারিশ করো, সাওয়াব পাবে; আর আল্লাহ তাঁর নবীর মুখে তাই জারি করেন, যা তিনি পছন্দ করেন।”

(মুসলিম, পৃষ্ঠা: ১৪১৪, হাদিস: ২৬২৭)

কুরআন ও হাদিসে সকল মুসলমানকে একে অপরের ভাই বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মুসলমানদের মাঝে এই দ্বীনি সম্পর্ক গড়ে তোলার মূল কারণও হলো যাতে সকল মুসলমান পরস্পর ঐক্য, সংহতি ও ভালোবাসার সাথে জীবন অতিবাহিত করে। একজন মুসলমান যেন অন্য মুসলমান ভাইয়ের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করে এবং তার কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা দূর করার চেষ্টা করে। যদি সে নিজে সরাসরি তার ভাইয়ের সমস্যার সমাধান করতে পারে, তবে যেন নিজেই করে; নতুবা এমন কোনো মুসলমান ভাইয়ের কাছে তার সমস্যার সমাধানের জন্য সুপারিশ করে, যে তা সমাধান করতে সক্ষম। কোনো মুসলমান ভাইকে সাহায্য করার জন্য অন্য মুসলমান ভাইয়ের কাছে সুপারিশ করাও মূলত এক ধরনের সাহায্য যদি সেই সুপারিশ শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হয়।

সুপারিশ করা মুস্তাহাব:

আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেন: “এর অর্থ হলো তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কারো জন্য সুপারিশ করে, এতে তোমাদের জন্য সাওয়াব রয়েছে। যখন তোমরা আমার কাছে কোনো অভাবী মানুষের জন্য সুপারিশ করো এবং আমি আল্লাহর ফয়সালা অনুযায়ী তার প্রয়োজন পূরণ করে দিলে, তখন তোমরাও সওয়াব পাবে।” সুপারিশ করা মুস্তাহাব; কুরআন ও হাদিসে এর প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا -

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ যে ব্যক্তি ভাল সুপারিশ করে, তার জন্য সেটার মধ্যে অংশ রয়েছে। (সূরা নিসা, আয়াতঃ ৮৫)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেনঃ "যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে, আল্লাহ পাকও ততক্ষণ তার সাহায্যে থাকেন।" (উমদাতুল কারী, ৬/৪১০, হাদিসঃ ১৪৩২)

কল্যাণকামী হওয়ার অনুপ্রেরণাঃ

আল্লামা মুহাম্মদ বিন আল্লান শাফেয়ী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেনঃ "এই হাদিসে পাকে ভালো কাজ করা, কল্যাণের মাধ্যম হওয়া, কারো বিপদ দেখলে তার জন্য সুপারিশ করা এবং দূর্বলকে সাহায্য করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, সবার পক্ষে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয় না এবং সবাই নিজের কথা অন্যকে স্পষ্টভাবে বোঝাতেও পারে না। (তাই যারা অফিসার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেন এবং অন্যের কথা বুঝিয়ে বলতে পারেন, তারা যেন সুপারিশ করেন এবং অভাবী মানুষের সমস্যার সমাধান করে দেন)। তবে যেসব কাজে সুপারিশ করা জায়েয নেই, সেগুলো এই হাদিসের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (দালিলুল ফালেহীন, ২/৪২, হাদিসঃ ২৪৭) (যেমন কোনো অযোগ্য ব্যক্তিকে পদ পাইয়ে দেওয়ার সুপারিশ, গুনাহের কাজের সুপারিশ অথবা এমন কোনো সুপারিশ যার ফলে অন্য মুসলমানের অধিকার খর্ব হয়।)

সুপারিশকারী সর্বাবস্থায় সাওয়াব পাবেনঃ

আলোচ্য হাদিসে মুসলমানের জন্য সুপারিশকারীকে সাওয়াবের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। তবে কি সুপারিশকারী সর্বাবস্থায় সাওয়াব পাবেন? এ প্রসঙ্গে আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ হাদিসের শেষাংশের (আল্লাহ তাঁর নবীর মুখে তাই জারি করেন যা তিনি পছন্দ করেন) ব্যাখ্যায় বলেনঃ "এটি এই বিষয়ের বর্ণনা যে, যিনি সুপারিশ করবেন তিনি সর্বাবস্থায় সাওয়াব পাবেন, চাই তার সুপারিশ কবুল হোক বা না হোক। উচ্চপদস্থ কারো উচিত নয় তার চেয়ে নিচু স্তরের মানুষের কাছে সুপারিশ করতে সংকোচ করা; আবার যদি সুপারিশ গ্রহণ করা না হয়, তবে সুপারিশকারীকে কষ্ট দেওয়াও উচিত নয়। নিঃসন্দেহে নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদাতুনা বারীরা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا এর কাছে সুপারিশ করেছিলেন (অর্থাৎ পরামর্শ হিসেবে বলেছিলেন) যেন তিনি তাঁর পূর্বের স্বামীর কাছে ফিরে যান, কিন্তু তিনি অপারগতা পেশ করে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।" (উমদাতুল কারী, ৬/৪১০, হাদিসঃ ১৪৩২)

"আল্লাহ পাক তাঁর নবীর মুখে তাই জারি করেন যা তিনি পছন্দ করেন" এর ব্যাখ্যায় আল্লামা মুহাম্মদ বিন আল্লান শাফেয়ী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেনঃ "অর্থাৎ তাঁর ইলমে আযলী (অনাদি জ্ঞান) অনুযায়ী যার ব্যাপারে তিনি ইচ্ছা করেন যে, তার সুপারিশের বিষয়টি এমন হবে, তার উদ্দেশ্য সফল হবে কি হবে না ইত্যাদি। সুতরাং সুপারিশ করা এবং এর ওপর অর্জিত সাওয়াবই হলো কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য, যা সুপারিশ করার কারণে সর্বাবস্থায় অর্জিত হবে; আল্লাহর জ্ঞানে তার উদ্দেশ্য সফল হওয়া লেখা থাকুক বা না থাকুক।" (দালিলুল ফালেহীন, ২/৪২, হাদিসঃ ২৪৭)

হাদিসে পাকে বর্ণিত হয়েছে যে, কথা বা কাজের মাধ্যমে মুসলমানকে সাহায্য করার মাঝে

সাওয়াব নিহিত। যদি কারো কোনো ত্রুটি হয়ে যায় এবং তাতে যদি 'হদ' (শরিয়ত নির্ধারিত শাস্তি) না থাকে, তবে তার জন্য সুপারিশ করা জায়েয; যদি সে তার ভুলের জন্য লজ্জিত হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমতাবস্থায় শাসকের উচিত তাকে ক্ষমা করে দেওয়া কিন্তু যে ব্যক্তি ভুল বা অন্যায় কাজে অটল থাকে, তার জন্য সুপারিশ করা যাবে না এবং শাসকও তাকে ক্ষমা করবেন না, যাতে মানুষ সেই অন্যায় থেকে বিরত থাকে। তবে দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে সুপারিশ করা জায়েয নয়।

(ইকমালুল মুআল্লিম, ৮/১০৭, হাদিস: ২৬২৭)

এমন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ যার কোনো গুনাহের কারণে হদ কার্যকর করার ফয়সালা হয়ে গেছে অথবা যার সুপারিশের ফলে অন্য মুসলমানের হক নষ্ট হয়। মক্কা বিজয়ের সময় মাখজুমিয়া গোত্রের এক মহিলা চুরি করলে তার গোত্রের লোকেরা বলাবলি করতে লাগল; রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর কাছে তার জন্য কে সুপারিশ করবে? একমাত্র রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর অত্যন্ত আদরের পাত্র হযরত উসামা বিন জায়েদ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ছাড়া আর কার সুপারিশ করার সাহস আছে? ফলে তারা তাঁর কাছে সুপারিশের জন্য এল। যখন হযরত সায়্যিদুনা উসামা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ সেই মহিলার ব্যাপারে সুপারিশ করলেন, তখন সরকারে মদিনা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর নূরানি চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল এবং তিনি ইরশাদ করলেন: "তুমি আমার কাছে আল্লাহ পাকের নির্ধারিত হদসমূহের একটির ব্যাপারে সুপারিশ করছ?" হযরত উসামা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ আরয করলেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।" এরপর নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুতবা দিলেন, আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন এবং ইরশাদ করলেন: "হে লোকসকল! তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করত তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত, আর যখন কোনো দূর্বল বা গরিব লোক চুরি করত তখন তার ওপর হদ কায়েম করত। সেই সত্তার শপথ যাঁর কবজায় মুহাম্মদের صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রাণ! যদি মুহাম্মদ-এর কন্যা ফাতেমাও চুরি করত, তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম।" **(বুখারী, ৩/১০৮, হাদিস: ৪৩০৪)**

নাজায়িয সুপারিশের প্লাবন: একটি চিন্তনীয় বিষয়:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল আমাদের সমাজে সুপারিশের প্রবণতা খুব বেশি বেড়ে গেছে। সামান্য কাজ থেকে শুরু করে যেকোনো বড় কাজে সুপারিশ যেন অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। বড় বড় শহরগুলোতে এবং দ্বীনি ও দুনিয়াবী প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানে সুপারিশের সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছে। কারো চাকরির প্রয়োজন হলে তার জন্য সুপারিশ, কোনো প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য সুপারিশ, ফরম জমা দিতে সুপারিশ, বিল জমা দিতে সুপারিশ, কোনো প্রজেক্ট নিতে সুপারিশ, জমি কেনায় সুপারিশ, কোনো প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা ফ্যাক্টরি খুলতে সুপারিশ, বর্তমান পদ থেকে উচ্চপদে পদোন্নতির জন্য সুপারিশ, দোকান খুলতে সুপারিশ কিংবা বাড়ি বিক্রিতে সুপারিশ মোটকথা কোনো কাজই যেন সুপারিশ ছাড়া হয় না।

মনে রাখবেন, যদি সুপারিশ কোনো যোগ্য ব্যক্তির জন্য হয়, কোনো জায়েয কাজের জন্য হয়, কারো সঠিক অধিকার পাইয়ে দেওয়ার জন্য হয় কিংবা কাউকে জুলুম থেকে বাঁচানোর জন্য হয় অথবা এমন কোনো অবস্থায় হয় যাতে শরিয়ত সুপারিশ করার অনুমতি দিয়েছে, তবে এতে কোনো ক্ষতি নেই; বরং ক্ষেত্র বিশেষে এমন সুপারিশ করা মুস্তাহাব এবং সাওয়াবের কাজ কিন্তু যদি সুপারিশ কোনো অযোগ্য ব্যক্তির জন্য হয়, কোনো নাজায়েয কাজের জন্য হয়, কাউকে অন্যায়ভাবে কোনো সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার জন্য হয় অথবা এই সুপারিশের কারণে অন্য কোনো মুসলমানের হক নষ্ট হয়, তার ওপর জুলুম করা হয় কিংবা এমন ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ করা হয় যার ওপর হদ ওয়াজিব হয়ে গেছে অথবা অন্য কোনো এমন ক্ষেত্র হয় যার অনুমতি শরিয়ত দেয়নি তবে এমন সুপারিশ করা নাজায়েয ও হারাম, গুনাহে কবিরা এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। নাজায়িয সুপারিশে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়েই ধ্বংস ও বরবাদি অবধারিত। নাজায়িয সুপারিশ সমাজের অবক্ষয়ের একটি বড় কারণ। এটি পারস্পরিক ভালোবাসা মিটিয়ে দেয় এবং ঘৃণা বাড়িয়ে দেয়। নাজায়িয সুপারিশের কারণে দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিরা অবহেলিত হয় এবং এটি রিযিকের সংকীর্ণতারও কারণ। মোটকথা, নাজায়িয সুপারিশে কোনো কল্যাণ নেই। নিশ্চয়ই বুদ্ধিমত্তা হলো নাজায়িয সুপারিশ ত্যাগ করে কেবল জায়েয সুপারিশ করা। এর ফলে যোগ্য ও মেধাবী মানুষরা সামনে আসার সুযোগ পাবে এবং এর বরকতে একটি আদর্শ, শান্তিপূর্ণ ও উন্নত সমাজ গঠনে সাহায্য মিলবে। اِنْ شَآءَ اللّٰہ!

সারকথা হলোঃ

১. সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই এবং তারা একটি দেহের মতো। সবার উচিত একে অপরের কল্যাণ কামনা ও সাহায্য করা।

২. যদি কোনো মুসলমান ভাইকে শরিয়তসম্মত জায়েয সুপারিশের মাধ্যমে সাহায্য করার প্রয়োজন হয়, তবে অবশ্যই তাকে সাহায্য করা উচিত।

৩. যদি কোনো ব্যক্তি যোগ্য হয় কিংবা কারো জায়েয হক পাইয়ে দিতে হয় অথবা কারো এমন ভুল ক্ষমা করাতে হয় যাতে সে লজ্জিত এবং তার ওপর কোনো শরয়ী হদ নেই তবে এমন ব্যক্তিদের পক্ষে সুপারিশ করা সম্পূর্ণ জায়েয।

৪. অযোগ্য ও জালিমের জন্য, কোনো মুসলমানের অধিকার খর্ব করার জন্য কিংবা আল্লাহর নির্ধারিত 'হদ' মাফ করানোর জন্য সুপারিশ করা হারাম।

৫. জায়েয সুপারিশ অবশ্যই করা উচিত, কারণ জায়েয সুপারিশকারী তার ভালো নিয়তের কারণে সর্বাবস্থায় সওয়াব পাবেন; চাই তার সুপারিশ কবুল হোক বা না হোক।

আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করি, তিনি মুসলমানদের পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতি দান করুক। একে অপরকে সাহায্য করার এবং একে অপরের দুঃখ-কষ্টে পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা দান করুক। জায়েয সুপারিশ করার এবং নাজায়িয সুপারিশ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

সর্বশেষ নবী মুহাম্মদে আরাবী ﷺ এর হাঁটার ধরণ

মাওলানা নাসির জামাল আত্তারী মাদানী

পবিত্র জীবনীর অধ্যয়ন হলো এমন এক পূর্ণাঙ্গ আদর্শের সন্ধান, যার প্রতিটি কর্মে হিকমত, ভারসাম্য এবং চারিত্রিক সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর জীবনীর কিছু দিক যেমন তাঁর ওঠা-বসা, কথা বলার ভঙ্গি এবং হাঁটার পদ্ধতি মূলত হুযুরে আকরাম নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর গাম্ভীর্যের বহিঃপ্রকাশ। সাহাবায়ে কেরাম رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সীরাতের এই সমস্ত দিক অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে সংরক্ষণ করেছেন এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বর্ণনা করেছেন। আসুন, নিচে তাঁর হাঁটার পদ্ধতির কিছু ঝলক দেখে নিই:

নালাইন শরীফের ব্যবহার

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: খালি পায়ে হাঁটা রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সাধারণ অভ্যাস ছিল না। (আখবারে-মক্কা, ৪/৮০) তবে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো কখনো খালি পায়ে হাঁটার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। যেমন একবার হযরত ফাদালা বিন উবাইদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, আপনি কেন জুতো পরেননি? তখন তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন কখনো কখনো আমরা খালি পায়েও হাঁটি।

(আবু দাউদ, ৪/১০২, হাদিস: ৪১৬০)

আখেরী নবীর হাঁটার গতি

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেয়ে সুন্দর আর কাউকে দেখিনি; মনে হতো যেন সূর্য তাঁর পবিত্র চেহারায় খেলা করছে। আর আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর চেয়ে দ্রুত কাউকে হাঁটতে দেখিনি; মনে হতো যেন জমিন তাঁর জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে। আমরা তাঁর সাথে তাল মেলাতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়তাম, অথচ তিনি স্বাভাবিক গতিতেই হাঁটতেন।

(শামায়েলে তিরমিযী, পৃষ্ঠা-৮৬)

মনে রাখবেন, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর গতির দ্রুততা ছিল পথ অতিক্রান্ত হওয়ার বিচারে, দ্রুত হাঁটার বিচারে নয়। হুযুরে আনোয়ার অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সাথে ধীরে হাঁটতেন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: ﴿وَ اقۡصِدۡ فِیۡ مَشۡیِکَ﴾ কিন্তু তাঁর ধীরে হাঁটা সত্ত্বেও পথ খুব দ্রুত ও অনেক বেশি অতিক্রান্ত হতো। এতে রবের উদ্দেশ্য ছিল যেন কোনো ব্যক্তি আমার মাহবুবের চেয়ে আগে চলতে না পারে। ﴿لَا تُقَدِّمُوۡا بَیۡنَ یَدَیِ اللّٰہِ وَ رَسُوۡلِہٖ﴾ এই আয়াতের ওপর আমল আল্লাহ পাক স্বয়ং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর মাধ্যমে করিয়ে নিয়েছেন।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৬১)

ধীরে হাঁটা সত্ত্বেও পথ দ্রুত ফুরিয়ে যাওয়া ছিল হুযুরে আনোয়ারের এক মুজিযা। কিছু সূফী ও বুযুর্গদেরও এই কারামত দান করা হয় যাকে 'তইয়ুল আরদ' (জমিন সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া) বলা হয়। মেরাজের রাতে হুযুরে আনোয়ার কেবল জমিনই সংকীর্ণ করে নেননি বরং জমিন ও আসমান, আরশ ও কুরসি, লাওহ ও কলম সবই অতিক্রান্ত করেছিলেন। আসিফ ইবনে বরখিয়ার 'তইয়ুল আরদ'-এর কথা তো কুরআন মাজীদ দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: اَنَا اٰتِیۡکَ بِہٖ قَبۡلَ اَنۡ یَّرۡتَدَّ اِلَیۡکَ طَرۡفُکَ (আমি রানী বিলকিসের সিংহাসন আপনার চোখের পলক ফেলার আগেই ইয়েমেন থেকে আপনার কাছে নিয়ে আসব)।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৬১)

কদম ওঠানো ও ফেলার ধরণ

মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যখন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতেন, তখন বলতেন: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন হাঁটতেন তখন দৃঢ়তার সাথে কদম ওঠাতেন, তাঁর হাঁটা এমন ছিল যেন তিনি কোনো উঁচু স্থান থেকে নিচের দিকে নামছেন। (শামায়েলে তিরমিযী, পৃষ্ঠা-৮৭)

হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরও বলেন: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন হাঁটতেন তখন সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে হাঁটতেন, মনে হতো যেন পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে নামছেন।

(শামায়েলে তিরমিযী, পৃষ্ঠা-৮৬)

ইয়ে রাহা মেরা সর, সিনা কলব-ও-জিগর
রাখ দো আকা কদম, তাজদারে হরম

আল্লাহ পাকের আখেরী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাঁটার সময় জুতোর শব্দ অপছন্দ করতেন। সুতরাং হযরত আবু উমামা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রচণ্ড গরমের দিনে জান্নাতুল বাকির দিকে তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং তাঁর পেছনে অন্য লোকেরাও আসতেন। যখন তিনি তাঁদের জুতোর শব্দ শুনতেন, তখন বিষয়টি তাঁর কাছে খুব অপ্রীতিকর মনে হতো। ফলে তিনি বসে পড়তেন এবং ততক্ষণ অপেক্ষা করতেন যতক্ষণ না তারা সামনে এগিয়ে যেত। তিনি এটি এ কারণে করতেন যেন মনে অহংকার সৃষ্টি না হয়। (ইবনে মাজাহ, ১/১৬০, হাদিস: ২৪৫)

পাশ দিয়ে অতিক্রম করার ধরণ

হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: আল্লাহর নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন হাঁটতেন তখন দ্রুত কদমে হাঁটতেন; বোঝা যেত এটি

কোনো অক্ষম ব্যক্তির হাঁটা নয় এবং কোনো অলস ব্যক্তিরও নয়। (শারহুস সুন্নাহ, ৬/৩৭৭, হাদিস: ৩২৪৬; শারহু আবি দাউদ লি-ইবনে রাসলান, ১০/২২৩)

আল্লাহ পাকের আখেরী নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নারীদের মাঝখান দিয়ে যাতায়াত করতে নিষেধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে দুটি বর্ণনা লক্ষ্য করুন: (১) হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পুরুষকে দুজন নারীর মাঝখান দিয়ে হাঁটতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, ৪/৪৭০, হাদিস: ৫২৭৩) (২) এক জায়গায় তিনি ইরশাদ করেছেন: যখন তোমাদের সামনে নারীরা এসে পড়ে, তখন তাদের মাঝখান দিয়ে যেও না; বরং ডানে অথবা বামে সরে গিয়ে পথ ধরো। (শুয়াবুল ঈমান, ৪/৩৭১, হাদিস: ৫৪৪৭)

নিঃসন্দেহে কুরআনুল কারীম হলো জীবন বিধান এবং আল্লাহ পাকের আখেরী নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সীরাত মুবারক হলো এই কুরআনের বাস্তব তাফসীর। তাই কুরআনে যে মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে, হুযুর রহমতে আলম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের মুবারক বাণী বা আমলের মাধ্যমে তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যেন উম্মতের জন্য তা অনুসরণ করা সহজ হয়।

আল্লাহর শেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর হাঁটার ধরণ থেকে আমরা কয়েকটি আদব শিখতে পারি: (১) জুতো বা স্যান্ডেল পরে হাঁটুন যাতে পা নোংরা, ময়লা এবং কষ্টদায়ক বস্তু থেকে নিরাপদ থাকে। (২) রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটবেন না বরং কিনারা দিয়ে হাঁটুন। (৩) হাঁটার সময় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করুন; রোগীদের মতো খুব ধীরেও নয় আবার এত দ্রুতও নয় যে, মানুষ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। (৪) দুশ্চরিত্র লোকদের মতো বুক ফুলিয়ে হাঁটবেন না বরং ভদ্রোচিত ভঙ্গি বজায় রাখুন। (৫) রাস্তায় মহিলাদের মাঝখান দিয়ে যাওয়া নিষেধ, তাই এমন পরিস্থিতিতে পাশ দিয়ে চলে যান। (৬) হাঁটার সময় অহেতুক দৃষ্টিপাত থেকে বিরত থাকুন এবং দৃষ্টি অবনত রেখে হাঁটার চেষ্টা করুন। (৭) চেষ্টা করুন যেন হাঁটার সময় জুতোর শব্দ না হয়।

আল্লাহ পাক আমাদের হাঁটার সুন্নত ও আদবগুলো খেয়াল রাখার তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِیِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হারিয়ে যাওয়া দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল

মাওলানা সৈয়দ ইমরান আখতার আত্তারী মাদানী

প্রিয় ছোট্ট বন্ধুরা! আমাদের প্রিয় আকা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর মুজিযাসমূহ বারবার মানুষের বিপদের আশ্রয় হয়েছে এবং মানুষের ললাট থেকে দুশ্চিন্তার রেখা দূর করেছে। আজ আমরা এমন একটি মুজিযা সম্পর্কে শুনব যার মাধ্যমে একজন সাহাবীয়ে রাসূলের হারিয়ে যাওয়া দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে। সুতরাং

হযরত ফুদাইক বিন আমর সালামানী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর উভয় চোখ সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি সেগুলো দিয়ে কিছুই দেখতে পারতেন না। তিনি রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় দরবারে হাজির হলেন। চিকিৎসকদের চিকিৎসক, আল্লাহ পাকের হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর কাছে জানতে চাইলেন: তোমার কী হয়েছে? তিনি আরয করলেন: আমার পা সাপের ডিমের ওপর পড়ে গিয়েছিল, যার ফলে আমার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর উভয় চোখে নিজের পবিত্র লালা মোবারক দিলেন, ফলে তিনি তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন; এমনকি তিনি ৮০ বছর বয়সেও সুঁইয়ে সুতা ঢুকাতে পারতেন।

(মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা, ১২/৮১, হাদিস: ২৪০২৯)

হুযুরে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর পবিত্র লালা মোবারকের বরকতে দৃষ্টিহীন হয়ে যাওয়া সাহাবীর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসা, বরং আশি বছর বয়সেও দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা এমনভাবে বজায় থাকা যে, সুঁইয়ে সুতা পরানো যায়, নিশ্চয়ই এটি তাঁর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক মহান মুজিযা। এই ঘটনা থেকে আমরা অনেক চমৎকার কথা শিখতে পারি:

অসুস্থতা বা বিপদে হতাশ হওয়ার পরিবর্তে আল্লাহ পাকের ওপর ভরসা রাখা উচিত, কারণ তিনি যখন চান মুশকিল সহজ করে দেন।

নিজের কষ্ট লুকিয়ে রাখার পরিবর্তে যথাযথ সময়ে নেককার ব্যক্তিদের কাছে সাহায্য ও দোয়ার দরখাস্ত করা উচিত।

কাউকে কষ্টে দেখলে উদাসীন না হয়ে বরং সহমর্মিতার সাথে তাঁর খোঁজখবর নেওয়া উচিত।

পিতা-মাতা তাঁদের সন্তানের কল্যাণ ও চিকিৎসার জন্য চিন্তিত থাকেন এবং ছোটাছুটি করেন; সন্তানদেরও উচিত তাঁদের কদর করা এবং যখন তাঁদের নিজেদের সহমর্মিতার প্রয়োজন হয় বিশেষ করে বার্ধক্যে তখন তাঁদের জান-প্রাণ দিয়ে আগলে রাখা।

শারীরিক সুস্থতা আল্লাহ পাকের অনেক বড় নিয়ামত, এর ওপর সবসময় শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

বয়স বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ পাক চাইলে মানুষকে আশ্চর্যজনক শক্তি ও স্বাস্থ্য দান করতে পারেন, তাই সর্বাবস্থায় তাঁরই ওপর ভরসা রাখা উচিত।

আল্লাহ পাকের কুদরতের সামনে কোনো রোগ বা দূর্বলতা কঠিন নয়, তিনি যখন চান মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি বদলে দেন।

আমাদের প্রতিটি নিয়ামত বিশেষ করে চোখের মতো মহান নিয়ামতের হেফাযত করা উচিত এবং এগুলোকে নেক কাজে ব্যবহার করা উচিত।

রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর সীরাত মুবারক মানুষের সাথে দয়া, ভালোবাসা ও কল্যাণ কামনার শিক্ষা দেয়।

মাদানী মুযাকারার প্রশ্নোত্তর

(১) হিটারের সামনে নামায পড়া কেমন?

প্রশ্ন: আজকাল মসজিদে হিটার লাগানো থাকে যেখান থেকে আগুনের আভা বের হয়, এগুলোর সামনে কি নামায পড়া যাবে?

উত্তর: পড়া যাবে; হিটারের আগুন সেই আগুন নয় যার পূজা করা হয়। তবে প্রজ্জ্বলিত আগুনের সামনে নামায পড়া মাকরূহে তানযিহী। (মাদানী মুযাকারা, ১১ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪২ হিজরী) (দ্রষ্টব্য: বিস্তারিত জানার জন্য দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত (দাওয়াতে ইসলামী)-এর ফাতাওয়া "হিটার ও চুলার সামনে নামাযের হুকুম কী?" পড়ুন)

(২) শীতকালে ক্রিম বা লোশন লাগানোর সময় ভালো নিয়ত করা

প্রশ্ন: শীতের কারণে শুষ্ক ত্বকে ক্রিম বা লোশন লাগানোর সময় কী নিয়ত হওয়া উচিত?

উত্তর: শীতের মৌসুমে শুষ্কতার কারণে চামড়া ফেটে যায়; ক্রিম বা লোশন লাগানোর সময় ত্বক বা চামড়া সুস্থ করার নিয়ত করে নিন। যেহেতু ক্রিমের মাধ্যমে ত্বক ভালো হয়ে যাবে, তাই এটি একটি চিকিৎসা, আর চিকিৎসা করা সুন্নাত (দেখুন: মালফুজাতে আলা হযরত, পৃষ্ঠা-৩৬৫)। সুতরাং এই সুন্নাতের ওপর আমলের নিয়ত করা যেতে পারে। এছাড়া এই নিয়ত করতে পারেন যে, ইবাদতের শক্তি অর্জনের লক্ষ্যে ভ্যাসলিন (Vaseline) ব্যবহার করছি; কারণ ক্রিম না লাগালে চামড়া ফেটে যাবে এবং অযুর সময় যখন ত্বকে পানি লাগবে তখন কষ্ট হবে। যেহেতু অযু নিজেই একটি ইবাদত এবং ইবাদত করার মাধ্যমও বটে, তাই অযুর কষ্ট থেকে বাঁচতে এবং ইবাদতের শক্তি অর্জনের নিয়তে ক্রিম ব্যবহার করুন।

(মাদানী মুযাকারা, ১৮ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪২ হিজরী)

(৩) গরুর বাচ্চা জন্ম নেওয়ার পরপরই বিক্রি করে দেওয়া কেমন?

প্রশ্ন: আমার ফার্মিং-এর একটি ছোট ব্যবসা আছে। যখন গাভী বাচ্চা দেয়, তখন অনেক খামারী সেটি বিক্রি (Sale) করে দেন; অথচ সেই বাচ্চাটি তখন পর্যন্ত তার মায়ের প্রথম দুধও পান করেনি। এমনটা করা কেমন?

উত্তর: সাধারণত ছোট বাচ্চা যদি 'নর' (ষাঁড়) হয় তবে তা এই কারণে বিক্রি করে দেওয়া হয় যে, সে বড় হয়ে দুধও দেবে না, বাচ্চাও দেবে না। এটি বিক্রি করা জায়েয। তবে কিছু মানুষ এমন পশুর প্রতি মায়া অনুভব করেন, আবার এমন মানুষের সংখ্যাও কম নয় যারা এই ধরনের পশুর গোশত খেতে পছন্দ করেন; কারণ এর গোশত অত্যন্ত নরম ও কোমল হয়। অপরাধী মানসিকতার কিছু হোটেল মালিক এমন পশুর চপ তৈরি করে খাসির গোশতের জায়গায় চালিয়ে দেয়; কারণ চপ যখন ভাজা হয় তখন বোঝা যায় না যে, এটি খাসির নাকি গরুর ছোট বাচ্চার। এটি সম্পূর্ণ ধোঁকাবাজি ও গুনাহ। কুরবানীর পশুর পেট থেকে যদি বাচ্চা জীবিত বের হয় তবে সেটিও জবেহ করা হবে এবং তার গোশত খাওয়া যাবে; আর যদি মৃত বের হয় তবে তা ফেলে দিতে হবে (দেখুন: বাহার-এ-শরীয়ত, ৩/৩৪৮)। যে গাভী থেকে মৃত বাচ্চা বের হয়েছে তার গোশত পাক বা পবিত্র হবে এবং তা খাওয়া জায়েয হবে। যদি কুরবানি করা হয়ে থাকে তবে সেটিও আদায় হয়ে যাবে। (মাদানী মুজাকারা, ২১ রবিউল আউয়াল ১৪৪২ হিজরী)

(৪) কবরের আযাব থেকে বাঁচার উপায়

প্রশ্ন: কবরের আযাব থেকে কীভাবে বাঁচা যায়?

উত্তর: যদি কোনো ব্যক্তি কবরের আযাব থেকে বাঁচতে চায়, তবে তার উচিত গুনাহ না করা বরং নেক আমল করতে থাকা। প্রতিদিন রাতে সূরাতুল মূলক পাঠ করলেও কবরের আযাব থেকে সুরক্ষা মেলে; কারণ সূরাতুল মূলকের একটি নাম হলো "সূরাতুল মানি'আহ" (سُوْرَةُ الْمَانِعَة) অর্থাৎ কবরের আযাব প্রতিরোধকারী (দেখুন: তিরমিযী, ৪/৪০৭, হাদিস: ২৮৯৯)। মনে রাখতে হবে, এখানে কেবল সূরাতুল মূলক পাঠের ওপর নির্ভর করে অন্যান্য ফরজ ও ওয়াজিবসমূহ ত্যাগ করা উদ্দেশ্য নয়; বরং সূরা পাঠের পাশাপাশি ফরজ ও ওয়াজিবসমূহ পালন করাও আবশ্যক।

(মাদানী মুযাকারা, ৩০ জিলকদ ১৪৪১ হিজরী)

(৫) গোশতের ভেতরের রক্ত কি পাক না নাপাক?

প্রশ্ন: গোশতের ভেতরে যে রক্ত থাকে তা কি পাক নাকি নাপাক? এছাড়া সেই রক্ত শরীর বা কাপড়ে লাগলে কি কাপড় নাপাক হয়ে যাবে?

উত্তর: গোশতের ভেতরে যে রক্ত থাকে তা পবিত্র (দেখুন: বাহারে-শরীয়ত, ১/৩৯২) এই পবিত্র রক্ত কাপড়ে লাগলে কাপড় নাপাক হবে না।

(মাদানী মুযাকারা, ১৩ মহররমুল হারাম ১৪৪৩ হিজরী)

(৬) একশ বছরের সাপ কি যা ইচ্ছা তাই হতে পারে?

প্রশ্ন: কিছু মানুষ বলে যে, "সাপ যখন একশ বছরের হয় তখন সে যা ইচ্ছা তাই হতে পারে।" এই কথাটি কতটুকু সঠিক?

উত্তর: যা ইচ্ছা তাই হওয়া বলতে কী বোঝায়? সাপ কি মানুষ হয়ে যায়? যারা নিজেদের বানরের বংশধর বলে তারা তো এখনও হোঁচট খাচ্ছে, এখন আবার সাপের দলও চলে এল!

এসব ভ্রান্ত ধারণার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। (মাদানী মুযাকারা, ৪ সফরুল মোযাফফর ১৪৪৩ হিজরী)

(৭) শিশুর নাম কখন রাখবেন?

প্রশ্ন: শিশুর নাম কত দিনের মধ্যে রাখা যায়?

উত্তর: নবজাতক শিশুর নাম রাখার জন্য দিনের কোনো সংখ্যা নির্ধারিত নেই। আমাদের এখানে তো জন্মের আগেই নাম খোঁজা হয় এবং কোনো একটি চমৎকার নাম ঠিক করে রাখা হয়, এরপর শিশু জন্ম নিলেই সেই নাম রাখার তাড়া দেখা যায়। তবে উত্তম হলো জন্মের সপ্তম দিনে নাম রাখা এবং ওই দিন আকিকা করা (দেখুন: বাহারে-শরীয়ত, ৩/৩৫৫)। তবে যদি কেউ প্রথম দিনেই নাম রেখে দেন তাতে কোনো অসুবিধা নেই। (নাম রাখার ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য জানতে মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "নাম রাখার আহকাম" পড়ুন)

(মাদানী মুযাকারা, ১১ সফরুল মোযাফফর ১৪৪৩ হিজরী)

(৮) পাখির ডানা কাটা কেমন?

প্রশ্ন: পাখির ডানা কি কাটা যাবে?

উত্তর: যদি প্রয়োজন থাকে এবং ডানা কাটা উপকারি হয় তবে ডানা কাটা যাবে। অনেক সময় পাখিকে পোষ মানানোর জন্য ডানা কাটা হয়, এতে কোনো অসুবিধা নেই।

(মাদানী মুযাকারা, ১৮ সফরুল মোজাফফর ১৪৪৩ হিজরী)

(৯) জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত কিছু ভুল ধারণা

প্রশ্ন: সাধারণ মানুষের মধ্যে এই কথা প্রচলিত আছে যে, কাক ডাকলে মেহমান আসে, দুধ পড়ে গেলে বিপদ কাটে এবং ডান হাত চুলকালে টাকা আসে; এই কথাগুলো কি সঠিক?

উত্তর: কাক ডাকলে মেহমান আসা, দুধ পড়লে বিপদ কাটা এবং হাত চুলকালে টাকা আসা এগুলো সবই সাধারণ মানুষের মনগড়া কথা; বাস্তবতার সাথে এগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই।

(মাদানী মুযাকারা, ৯ জিলকদ ১৪৪২ হিজরী)

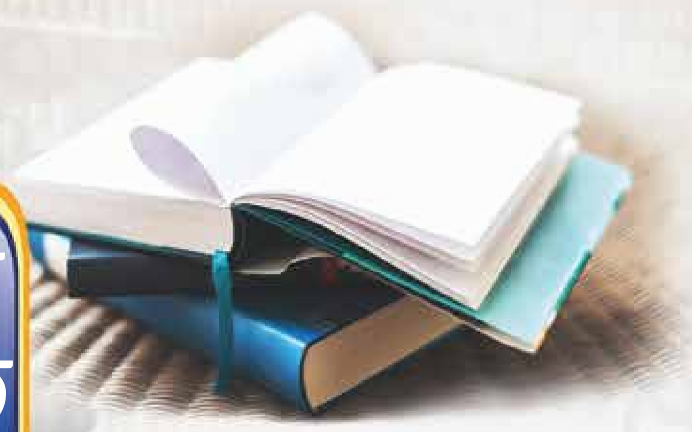

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত

মুফতি আবু মুহাম্মদ আলী আসগর আত্তারী মাদানী

নবী পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর শাহজাদাদের সংখ্যা কত?

প্রশ্ন: ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতিয়ানে শরীয়ত এ বিষয়ে কী বলেন যে, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর পুত্র (সাহেবজাদা)-দের সংখ্যা কত? তিন নাকি চার?

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلۡجَوَابُ بِعَوۡنِ الۡمَلِکِ الۡوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَایَةَ الۡحَقِّ وَالصَّوَابِ

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর পুত্রদের সংখ্যার বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। যে বিষয়ে সকল আলেম একমত, তা হলো দুজন। হযরত কাসিম এবং হযরত ইব্রাহিম رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُمَا। একটি মত অনুযায়ী তিনজন কাসিম, ইব্রাহিম এবং আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُمۡ। হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এই মতটিকেই অধিক সঠিক বলেছেন। আবার কিছু বর্ণনায় তিনের অধিকও বলা হয়েছে।

শায়খে মুহাক্কিক رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ 'মাদারিজুন নবুওয়াত' গ্রন্থে বলেন: "রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যে পবিত্র সন্তানদের ব্যাপারে সকল আলেম একমত, তাঁরা ছয়জন। তাঁদের মধ্যে দুজন হলেন রাসূলজাদা হযরত কাসিম ও হযরত ইব্রাহিম এবং চারজন হলেন নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সাহেবজাদীগণ সায়্যিদা জয়নব, সায়্যিদা রুকাইয়া, সায়্যিদা উম্মে কুলসুম এবং সায়্যিদা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُمۡ। এছাড়া অন্যদের ব্যাপারে আলেমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কিছু আলেম বলেন যে, ইব্রাহিম ও কাসিম ছাড়াও আরেকজন পুত্র ছিলেন যাঁর নাম ছিল আব্দুল্লাহ এবং তিনি মক্কা শরীফেই অল্প বয়সে ইহকাল

ত্যাগ করেন। তাঁর উপাধি ছিল ‘তৈয়ব’ ও ‘তাহের’। অধিক সঠিক মত হলো; সাহেবজাদা তিনজন: কাসিম, ইব্রাহিম ও আব্দুল্লাহ এবং সাহেবজাদী চারজন।”

(মাদারিজুন নবুওয়াত, ২/৭২৪ - সীরাতে মোস্তফা, পৃষ্ঠা: ৫৫২)

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আরশ ও কুরসি থেকেও শ্রেষ্ঠ জমিনের অংশ

প্রশ্ন: ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে কী বলেন যে, আমরা শুনেছি জমিনের যে অংশের সাথে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর পবিত্র শরীর স্পর্শ করে আছে, জমিনের সেই টুকরোটি মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু এমনকি আরশ ও কুরসি থেকেও শ্রেষ্ঠ; শরীয়ত এ সম্পর্কে কী বলে?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

আপনি যা শুনেছেন তা একদম সঠিক। ওলামায়ে কেরাম তাঁদের কিতাবসমূহে এটি বর্ণনা করেছেন; বরং এ বিষয়ে ঐক্যমত নকল করেছেন যে, কবরে আনোয়ারের সেই বরকতময় অংশ যার সাথে হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর পবিত্র শরীর স্পর্শ লেগে আছে, তা কাবা শরীফ এবং পৃথিবীর প্রতিটি ভূখণ্ড থেকে শ্রেষ্ঠ। এমনকি আরশ ও কুরসি থেকেও সেই অংশটি শ্রেষ্ঠ।

মক্কা ও মদিনার মধ্যে কোন শহরটি অধিক শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে ইমামদের মতভেদ বর্ণনা করার পর আল্লামা তাহতাভী হানাফী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ইরশাদ করেন: والخلاف في غير البقعة التي دفن بها صلّى الله عليه واٰله وسلّم فإنها أفضل حتى من العرش والكرسي بالإجماع” অর্থাৎ, মক্কা ও মদিনার শ্রেষ্ঠত্বের মতভেদ জমিনের সেই বরকতময় অংশে নেই যাতে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমাহিত আছেন; কারণ জমিনের এই অংশটি মক্কা থেকে শ্রেষ্ঠ, এমনকি ইজমা অনুযায়ী আরশ ও কুরসি থেকেও শ্রেষ্ঠ। (হাশিয়াতুত তহতাভী আলাল মারাকী, পৃষ্ঠা: ১০৯)

উমদাতুল কারীতে আছে: وقال عياض أجمعوا “على أن موضع قبره صلّى الله عليه واٰله وسلّم أفضل بقاع অর্থাৎ, ইমাম কাজী আয়াজ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন যে, ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে ইজমা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর কবরে আনোয়ার জমিনের সমস্ত অংশ থেকে শ্রেষ্ঠ। (উমদাতুল কারী, ৭/৩৭৪ - আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া মাতান শারহুয যুরকানী, ১২/২৩৪ - মিরকাতুল মাফাতিহ, ৫/৬৪০, হাদিস: ২৭৫৭-এর অধীনে - আদ-দুররুল মুখতার মাতান রাদ্দুল মুহতার, ৪/৬২ - ফাতাওয়া রযবিয়া, ১০/৭১১)

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সাঁতার কাটার প্রমাণ

প্রশ্ন: ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে কী বলেন যে, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে কি পানিতে সাঁতার কাটার প্রমাণ আছে?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

হ্যাঁ! নবী পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে পানিতে সাঁতার কাটা প্রমাণিত।

নবী পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "أحسنت العوم في بئر بني عدي بن النجار" অর্থাৎ, আমি বনু আদি বিন নাজ্জারের কূপে চমৎকারভাবে সাঁতার কেটেছি। (আত-তাবকাতুল কুবরা লি-ইবনে সাদ, ১/১১৬)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন:

كان النبي صلَّى الله عليه واٰله وسلَّم وأصحابه يسبحون في غدير فقال صلَّى الله عليه واٰله وسلَّم لأصحابه: «ليسبح كل رجل منكم إلى صاحبه» فسبح كل رجل إلى صاحبه، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، ثم سبح النبي صلَّى الله عليه واٰله وسلَّم إلى أبي بكر، حتى عانقه

অর্থাৎ, নবী পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং তাঁর সাহাবীগণ একটি পুকুরে সাঁতার কাটতেন। একদা নবী পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবীদের বললেন: তোমাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ সঙ্গীর দিকে সাঁতার কেটে যাও। তখন প্রত্যেকে নিজ নিজ সঙ্গীর দিকে সাঁতার কেটে গেল। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বাকি রয়ে গেলেন। তখন নবী পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর দিকে সাঁতার কেটে গেলেন এমনকি তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। (শারহু মাযাহিব আহলে সুন্নাত, পৃষ্ঠা: ১৬২ - শারহুয যুরকানী, ১/৩০৯ - রুহুল বয়ান, ৬/৭৮, আল-মুমিনুন, ২৩ নংআয়াতের পাদটীকা)

وَاللهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হযরত সায়্যিদুনা আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ رضي الله عنه

মাওলানা আদনান আহমদ আত্তারী মাদানী

দীর্ঘদেহী, ছিপছিপে অথচ চনমনে শরীর, মাথা ও দাঁড়ি মেহেদীর রঙে রঞ্জিত, পবিত্র ও নূরানী চেহারার অধিকারী এমন এক ব্যক্তিত্ব যাঁকে দেখলে চোখে প্রশান্তি, অন্তরে আনন্দ এবং ঈমানে স্বাদ অনুভূত হতো।[১] তিনি কেবল কথার ফুলঝুড়ি নয় বরং চরিত্রের দিক থেকেও ছিলেন এক অকুতভয় যোদ্ধা। অত্যন্ত সদালাপী, বিনয়ী, লজ্জা ও শরাফতের মূর্ত প্রতীক এবং ইবাদত ও যুহদ-পরহেজগারিতে ছিলেন অনন্য। মুসলমানদের মাঝে থাকলে তিনি অত্যন্ত সদাচারী ও সদ্ভাবের সংমিশ্রণ থাকেন, আবার ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে এক দুর্ধষ সিংহ ও ক্ষুরধার তলোয়ারের মতো। রণকৌশলে এমন পারদর্শী যে, তাঁর রণকৌশলে যুদ্ধের ময়দানের চিত্র বদলে যেত; এমনই মেধাবী ছিলেন যে, বড় বড় কঠিন সমস্যাও অনায়াসে সমাধান হয়ে যেত। তিনি এমন এক সেনাপতি ছিলেন যাঁর বিরুদ্ধে কোনো সাধারণ সৈনিকেরও অভিযোগ করার সুযোগ থাকত না। তাঁর ধৈর্য এমন আকাশচুম্বী ছিল যে, যখন তাঁর কাছে পদচ্যুত হওয়ার সংবাদ পৌঁছাল, তিনি মুচকি হাসলেন এবং লোকজনের মাঝে নতুন সেনাপতির আগমনের ঘোষণা দিলেন।[২] তাঁর কপালে সুশোভিত ছিল সিরিয়া বিজয়ের মুকুট।[৩] সিরিয়ার গভর্নরের দায়িত্ব অর্পণ করা হলেও তিনি বেশ কয়েকদিন তা গোপন রেখেছিলেন।[৪] এই মহান বীর সেনাপতির আসল নাম হলো "আমের বিন আব্দুল্লাহ বিন জাররাহ", কিন্তু সারা বিশ্বে তিনি "আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ" নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

---

১ তবকাত ইবনে সাদ, ৩/৩১৬

২ ফুতুহুল শাম, ১/২৪

৩ আল-আসাবাহ, ৩/৪৭৬

৪ ফুতুহুল শাম, ১/৮৬

হযরত আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কুরাইশ বংশের অত্যন্ত স্বনামধন্য ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। সপ্তম পুরুষে গিয়ে তাঁর বংশধারা রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর বংশের সাথে মিলিত হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগেই হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর দাওয়াতে ইসলাম কবুল করেন এবং নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য দরবারে রিসালতে হাজির হন।[১]

তিনি সেই ১০ জন ভাগ্যবান সাহাবী তথা 'আশারা মুবাশশারা' (যাঁরা একযোগে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন)-দের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। দোজাহানের মালিক ও মুখতার صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। একবার হাবশা (আবিসিনিয়া) এবং দ্বিতীয়বার মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।[২]

একবার প্রিয় আকা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নাজরানবাসীদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করলেন: "আমি তোমাদের কাছে এমন এক বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে পাঠাবো, যিনি প্রকৃত অর্থেই আমীন (বিশ্বস্ত)।" অতঃপর নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে তাদের কাছে পাঠালেন।[৩]

বিশ্বচরাচরের অধিপতি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একদা ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উম্মতের একজন আমীন (বিশ্বস্ত ব্যক্তি) থাকে, আর হে উম্মত! আমাদের আমীন হলেন আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ।" (৮)

হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: মনে রাখতে হবে যে, এই গুণটি সকল সাহাবীর মধ্যেই বিদ্যমান ছিল, তবে হযরত আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মধ্যে তা পূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। হযরত সায়্যিদুনা আবু উবাইদাহর মাঝে আমানতদারী ছাড়াও আরও অনেক গুণ ছিল, তবে এই গুণটি ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। এজন্যই বলা হয়েছে যে, এই উম্মতের আমীন হলেন "আবু উবাইদাহ"; এর অর্থ এই নয় যে বাকি সাহাবীরা আমীন ছিলেন না, আবার এটিও নয় যে হযরত আবু উবাইদাহর মাঝে আমানতদারী ছাড়া আর কোনো গুণ ছিল না। (৯)

উহুদ যুদ্ধে যখন সকল নবীদের সর্দার صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর নূরানী কপালে শিরস্ত্রাণের (অর্থাৎ যুদ্ধে ব্যবহৃত টুপি) কড়া ঢুকে গিয়ে তিনি জখম হলেন, তখন হযরত আবু উবাইদাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তা দেখে ব্যথিত হয়ে পড়লেন এবং ইশকে রাসূলের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে নবীজির কাছে পৌঁছে সেই লোহার কড়াগুলো নিজের দাঁত দিয়ে টেনে বের করতে লাগলেন। প্রথম কড়াটি বের করার সময় তাঁর সামনের একটি দাঁত ভেঙে গেল; দ্বিতীয় কড়াটি বের করার সময় তাঁর দ্বিতীয় দাঁতটিও তাঁর প্রিয় মাহবুব করীম আকা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর কদম মোবারকে উৎসর্গ হয়ে গেল।[৪]

---

১ তাবকাতে ইবনে সাদ, ১/১৫৭
২ তাবকাতে ইবনে সাদ, ৩/৩১৩
৩ উসদুল গাবাহ, ২/১২৫

---

৪ বুখারী, ২/৫৪৬, ৫৪৫, হাদিস: ৩৭৪৫, ৩৭৪৪

হযরত আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ছিলেন দুনিয়া বিমুখ এক মহান জাহিদ। হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ যখন সিরিয়ায় তাশরীফ আনলেন, তখন তিনি ইসলামী বাহিনীর সেনাপতির সাথে সাক্ষাতের জন্য খোঁজ করতে লাগলেন। তিনি প্রত্যেকের সাথে সাক্ষাত করছিলেন এবং জিজ্ঞেস করছিলেন: “আমার ভাই আবু উবাইদাহ কোথায়?” কিছুক্ষণ পর হযরত আবু উবাইদাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হাজির হলে হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন যে, আমি তোমার ঘরে অবস্থান করব। শাসকদের জন্য তাঁর অতিবহিত জীবন, আসবাবপত্র ও গৃহের অবস্থা এক অনুকরণীয় আদর্শ। ঘর বলতে ছিল কেবল একটি ঝুপড়ি, যার না ছিল কোনো আড়ম্বর, না ছিল কোনো সাজসজ্জা। জীবন ধারণের উপকরণে ছিল না কোনো চাকচিক্য বা জৌলুস। তাঁর জীবনের মুহূর্তগুলোতে ছিল না কোনো অস্থিরতা বা হাহাকার। মোট আসবাবপত্র বলতে ছিল কেবল একটি তরবারি, একটি ঢাল এবং একটি জিন (ঘোড়ার আসন)। হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ জিজ্ঞেস করলেন: “ঘরে কি এইটুকুই আসবাব?” তিনি আরয করলেন: “এই আসবাবটুকুই আমাকে গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছে দেবে।” হযরত ওমর বললেন: “মেহমানকে কি কিছু খাওয়াবে না?” তখন তিনি স্বীয় থলি থেকে শুকনো রুটির কয়েকটি টুকরো বের করে পেশ করলেন; যা দেখে হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়লেন এবং কাঁদতে কাঁদতে ইরশাদ করলেন; “হে আবু উবাইদাহ! দুনিয়া তোমাকে আপন জালে আটকাতে পারেনি।”[১]

একবার তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ উটের পিঠের হাওদার চাটাইয়ের ওপর জিনের গদিকে বালিশ বানিয়ে শুয়ে ছিলেন। এমন সময় হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ তাশরীফ আনলেন। তাঁকে এই অবস্থায় দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন “আপনি অন্যদের মতো আরামদায়ক বিছানায় কেন শোন না?” তিনি আরয করলেন “আমার বিশ্রামের জন্য এটুকুই যথেষ্ট।”[২]

জান্নাতের সনদ পাওয়ার পরেও সকল সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان কখনো আল্লাহ পাকের গোপন কৌশল থেকে গাফেল ছিলেন না; বরং কিয়ামতের ভয়াবহতা, হাশরের ময়দানের আতঙ্ক এবং আমলের হিসাব, পরকালের এই বিষয়গুলো তাঁদের কখনো শান্তিতে থাকতে দিত না। হযরত সায়্যিদুনা আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ -এর অবস্থাও তেমনই ছিল। সুতরাং যখন তাঁর ওপর খোদাভীতি প্রবল হতো এবং দুনিয়ার পরীক্ষাময় জীবন ও ফিতনাগুলো দেখতেন, তখন তিনি স্বতস্ফূর্তভাবে বলে উঠতেন: “হায়! আমি যদি কোনো মেষ হতাম, যা বাড়ির লোকজন জবাই করে রান্না করে তার মাংস খেয়ে ফেলত এবং ঝোলটুকু পান করে নিত।”[৩]

আন্তর্জাতিক ইসলামিক স্কলার মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদরী সাহেব বলেন

---

১ মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৪৩৪; মিরকাতুল মাফাতিহ, ১০/৪৮৮, হাদিস: ৬১১৮

২ তাবকাতে ইবনে সাদ, ৩/৩১৩

৩ আজ-যুহদ লি-আবি দাউদ, পৃষ্ঠা: ১২৬, নাম্বার: ১২৩

যে, সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আশরাফুল মাখলুকাত এবং মানবীয় মর্যাদার মর্মার্থ নিশ্চিতভাবে আমাদের চেয়ে বেশি বুঝতেন। এই পবিত্র আত্মাগুলো مَعَاذَ الله অকৃতজ্ঞতা হিসেবে নয়, বরং খোদাভীতিতে অভিভূত হয়ে এবং আল্লাহ করীমের গোপন পাকড়াওয়ের ভয়ে বিনয়বশতঃ কখনো গাছ, কখনো মাটি, কখনো পাখি আবার কখনো চতুষ্পদ জন্তু হয়ে দুনিয়ায় না আসার ব্যাপারে নিজেদের উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছেন! কারণ পশুর ঈমানহীন মৃত্যুর কোনো ভয় নেই; তাকে অন্তিম মুহূর্তের কষ্ট, কবরের আতঙ্ক এবং জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে না। বরং তাঁরা তামান্না করতেন যে, হায়! আমরা যদি জন্মই না নিতাম![১]

কাশ কে মেঁ দুনিয়া মেঁ পয়দা না হুয়া হোতা
কবর ও হাশর কা সব গম খতম হো গয়া হোতা

একবার হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ চারশ দিনার তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাঁর দাসীকে ডেকে বললেন: "এত দিনার অমুকের ঘরে এবং এত দিনার অমুক অভাবী লোকের ঘরে পৌঁছে দাও।" যখন মাত্র দুই দিনার বাকি ছিল তখন পরিবারের লোকজন তা জানতে পেরে আরয করল: "আল্লাহর শপথ! আমরাও মিসকীন, আমাদেরও কিছু দান করুন।" তখন তিনি বাকি দুই দিনার পরিবারের সদস্যদের দিয়ে দিলেন।[২]

১ মুসান্নিফ ইবনে আবি শাইবা, ৮/১৭৩, নাম্বার: ১
২ তাবকাতে ইবনে সাদ, ৩/৩১৫

সিরিয়ায় যখন প্লেগ মহামারী ছড়িয়ে পড়ল, তখন তিনিও এই রোগে আক্রান্ত হলেন। ১৮ হিজরী সনে নামায পড়তে যাচ্ছিলেন, পথেই তাঁর ইন্তেকাল হয়ে যায়। এভাবে ৫৮ বছর বয়সে প্লেগ মহামারীর কারণে তিনি শাহাদাতের সুউচ্চ মর্যাদা লাভ করেন।[৩]

হযরত মুয়াজ বিন জাবাল رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ তাঁর জানাজা পড়ান।[৪] তাঁর নূরানী মাযার শরীফ সিরিয়ার "ঘোর বাইসান" শহরে অবস্থিত, যা সর্বস্তরের মানুষের জিয়ারতের কেন্দ্র।[৫]

শারহে মুসলিম ইমাম নববী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হযরত আবু উবাইদাহ رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর পবিত্র মাযারে এক আশ্চর্যজনক গাম্ভীর্য ও নূরানীয়ত ছেয়ে আছে, যা নিশ্চিতভাবে তাঁর উচ্চ মর্যাদারই পরিচয় দেয়। যখন আমি মাযার শরীফ জিয়ারতের সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম, তখন আমার কাছে অনেক অলৌকিক বিষয় প্রকাশিত হয়েছিল।[৬]

মুজাম-এ কবীর, ১/১৫৫, নাম্বার: ৩৬৩ (১৮) মারিফাতুস সাহাবা লি-আবি নুয়াইম, ১/১৬০ (১৯) তাহযিবুল আসমা ওয়াল লুগাত লিন-নববী, ২/৫৩৭।

৩ সগে মদীনা ক্যাহনা ক্যায়সা?, পৃষ্ঠা: ১৬
৪ ওয়াসায়িলে-বখশিশ (সংশোধিত), পৃষ্ঠা: ১৫৮
৫ আজ-যুহদ লিল ইমাম আহমদ, পৃষ্ঠা: ২৮৩, নাম্বার: ১৫৬২
৬

আপন বুযুর্গদের স্মরণ রাখুন

মাওলানা আবু মাজিদ মুহাম্মদ শাহিদ আত্তারী মাদানী

জুমাদাল উলা ইসলামি বর্ষপঞ্জির পঞ্চম মাস। এই মাসে যেসব সাহাবায়ে কেরাম, ইসলামি স্কলার (ওলামায়ে ইসলাম) এবং আউলিয়া ও মাশায়েখে এজাম ওফাত পেয়েছেন, তাঁদের মধ্য থেকে ১৩২ জনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি মাসিক 'ফয়যানে মদিনা'র জুমাদাল উলা ১৪৩৮ হিজরী থেকে ১৪৪৬ হিজরীর সংখ্যাগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে আরও ১৩ জনের পরিচিতি তুলে ধরা হলো:

সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ:

(১) হযরত জাবির বিন আমর বিন যায়েদ বিন আউফ বিন মাবযুল আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আনসারদের বনু মাযিন বিন নাজ্জার গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কায়েস, হারিস এবং আবু কিলাব নামে তাঁর তিনজন ভাই ছিলেন। হযরত জাবির رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মুতাহ যুদ্ধে (জুমাদাল উলা, ৮ হিজরী) শাহাদাতের সুধা পান করেন।[১]

(২) হযরত হারিস বিন নুমান বিন আসাফ আনসারী খাজরাজী নাজ্জারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ওহুদ এবং পরবর্তী অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মুতাহ যুদ্ধে (জুমাদাল উলা, ৮ হিজরী) শাহাদাত বরণ করেন।[২]

ওলামায়ে ইসলাম رَحِمَہُمُ اللّٰہُ السَّلَام:

(৩) জামে' মাকুল ও মানকুল হযরত আল্লামা মুফতি আবুল ফাতাহ ফারুকী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ভারতের হরিয়ানার থানেশ্বরের এক ইলমি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮ জুমাদাল উলা ৯৭৬ হিজরীতে ভারতের উত্তরপ্রদেশের আগ্রায় ওফাত লাভ করেন। তিনি ছিলেন এক শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও উস্তাযুল ওলামা; তাঁর ছাত্রসংখ্যা ছিল অনেক। তিনি আগ্রার মহল্লা মির রফিউদ্দিন সাফাভিতে দীর্ঘ ৫০ বছর শিক্ষকতার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[৩]

(৪) আফজালুল মুহাদ্দিসীন হযরত মাওলানা আহমদ আলী মুহাদ্দিসে সাহারানপুরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ আনুমানিক ১২২৫ হিজরীতে ভারতের উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই ৬ জুমাদাল উলা ১২৯৭ হিজরীতে

---

১ আল-আসাবা, ১/৫৫০ - ইসতিয়াব, ১/৩৬০
২ আল-আসাবা, ১/৬৯৪
৩ আগ্রা কে ২৮৩ আউলিয়া-এ-কেরাম কি সীরাত, পৃষ্ঠা: ৪৬৭, ৪৬৮

ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন হাফেযে কুরআন, মহান আলেম, শায়খুল হাদিস এবং সিহাহ সিত্তাহর মুহাশশী (টীকাকার) ও মুসাহহিহ (সংশোধক)। তিনি দিল্লির 'মাতবা-এ-আহমদী'-র প্রতিষ্ঠাতা এবং ভারতের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[১]

(৫) হযরত আল্লামা সৈয়দ আবু সুরূর মুহাম্মদ ঈদুল কাসেমী গিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ১২৮৭ হিজরীর ঈদুল আযহার দিনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬ জুমাদাল উলা ১৩৩৫ হিজরীতে ওফাত লাভ করেন। তাঁকে 'বাবুস-সাগীর' কবরস্থানে দাফন করা হয়। তিনি তাঁর পিতা, শায়খ ওমর আত্তার এবং সমসাময়িক অন্যান্য আলেমদের কাছ থেকে ইলমে দ্বীন অর্জন করেছিলেন। তিনি উকিল হিসেবে মজলুমদের অধিকার রক্ষায় কাজ করতেন।[২]

(৬) হযরত শায়খ আহমদ বিন আব্দুল লতিফ খতিব মানকাবাহভি জাভি মুহাজিরে মক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ১২৭৬ হিজরীতে ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিম সুমাত্রা প্রদেশের মিনানা কাবাও-এর এক ইলমি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯ জুমাদাল উলা ১৩৩৪ হিজরীতে মক্কা মোকাররমায় ওফাত লাভ করেন। তাঁকে জান্নাতুল মুয়াল্লা কবরস্থানে দাফন করা হয়। তিনি ছিলেন হাফেযে কুরআন এবং প্রাচীন ও আধুনিক ইসলামী জ্ঞান যেমন গণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে (ইলমে তওকিত ও যিজ) পারদর্শী। তিনি শায়খ মুহাম্মদ সালেহ কুর্দীর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন এবং মসজিদুল হারামের 'বাব যিয়াদাহ'-এর শিক্ষক ছিলেন। তিনি ছিলেন উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং ৪৬টি আরবি ও মালয়ী কিতাবের রচয়িতা।[৩]

(৭) হযরত মাওলানা আহমদ দীন মাখাডভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه হিজরীতে মাখাড শরীফের এক ইলমি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই ৩ জুমাদাল উলা ১৩৮৯ হিজরীতে ওফাত লাভ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী, হাফেজে কুরআন, শ্রেষ্ঠ আলেম এবং শায়খে তরিকত। তিনি 'মাদ্রাসা খানকাহ-এ-মুয়াল্লা মাওলানা মুহাম্মদ আলী মাখাডভী'-র একজন দক্ষ শিক্ষক ছিলেন। প্রখ্যাত আলেম মাওলানা মুহাম্মদ দীন মাখাডভী এবং মাওলানা গোলাম জয়নুদ্দিন তারগভী ছিলেন তাঁর ভাই।[৪]

(৮) উস্তাযুল উলামা হযরত মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আকবর রেজভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه মিয়ানওয়ালি জেলার পিপলানের এক ইলমি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং পিপলানেই ১৬ জুমাদাল উলা ১৪৪২ হিজরীতে ওফাত লাভ করেন। তিনি ছিলেন হাফেজে কুরআন, বিজ্ঞ আলেম এবং মুহাদ্দিসে আজম পাকিস্তানের শিষ্য। তিনি 'জামিয়া মাহমুদিয়া রেজভিয়া পিপলান' ও 'জামিয়া রেজভিয়া মাজহারুল ইসলাম ফয়সালাবাদ'-এর ফাজেল ছিলেন। তিনি আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন মাদ্রাসার একজন দক্ষ শিক্ষক ছিলেন। প্রখ্যাত ওয়ায়েজ মরহুম মাওলানা আতাউল মোস্তফা জামিল ছিলেন তাঁর ছাত্র।[৫]

---

১ হাদায়িকে হানাফিয়া, পৃষ্ঠা: ৫১০, হায়াতে মুহাদ্দিসে আলওয়ারী, পৃষ্ঠা: ১৪৯-১৫২

২ ইতহাফুল আকাবির, পৃষ্ঠা: ৪২৮

৩ আল-মুখতাসারুল হাবী, পৃষ্ঠা: ১১৫-১১৯

৪ তাযকিরায়ে ওলামায়ে আহলে সুন্নাত জেলা আটাক, পৃষ্ঠা: ২১০-২১৫

৫ তাযকিরায়ে উলামায়ে আহলে সুন্নাত মিয়ানওয়ালি, পৃষ্ঠা: ৯৩, ৯৪

আউলিয়া ও মাশায়েখে কেরাম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِمۡ:

(৯) শাহজাদা-এ-গাউসুল ওয়ারা হযরত সৈয়দ আব্দুর রহীম কাদেরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ছিলেন কাশফ ও কারামতের অধিকারী এবং জাহেরী ও বাতেনী ফয়েজের আধার। তিনি যৌবনকালে সুরাটে আসেন এবং সারাজীবন হিদায়েতের কাজে মশগুল ছিলেন। তিনি ৭ জুমাদাল উলা ১২৪৭ হিজরীতে ওফাত লাভ করেন। তাঁর মাজার ভারতের গুজরাট প্রদেশের সুরাটে অবস্থিত।[১]

(১০) হযরত শায়খ সৈয়দ মুহাম্মদ বদরুদ্দিন জু'বী জিলানী তরাবলুসী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ছিলেন প্রখ্যাত আলেম, ফকিহ, খতিব ও শিক্ষক। তিনি জামে' মানসুরি কবিরের ইমাম, 'খতিবুল আত্তার' এবং সুইকা মহল্লার খানকাহর সাজ্জাদানশীন ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন প্রভাবশালী ওয়ায়েজ, কারামতধারী ওলী এবং শায়খে তরিকত। তিনি কাদেরিয়া, রিফাইয়া, বদভিয়া, দসুখিয়া, শাজলিয়া, নকশবন্দীয়া এবং খালওয়াতিয়া সিলসিলার শায়খ ছিলেন। জুমাদাল উলা ১২৭৯ হিজরীতে কনস্টান্টিনোপলে (বর্তমান ইস্তাম্বুল) তাঁর ওফাত হয় এবং তাঁকে 'ইয়াহইয়া আফেন্দী বেশিকতাশ' কবরস্থানে দাফন করা হয়।[২]

(১১) হযরত মাওলানা মিয়া মুহাম্মদ শরীফ চিশতী শিয়ালভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ১২৮৭ হিজরীতে খুশাব জেলার ওয়াদি সুন সেকেসরের সারকি শরীফে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই ২৫ জুমাদাল উলা ১৩৩৫ হিজরীতে ওফাত লাভ করেন। তিনি ছিলেন একজন আমলদার আলেম, খাজা শামসুল আরেফীনের মুরিদ এবং খাজা মুহাম্মদ দীন শিয়ালভীর খলিফা। তিনি ছিলেন দক্ষ শিক্ষক, ছাত্রদের কল্যাণকামী এবং সারকি শরীফ দরবার আলীয়ার প্রথম সাজ্জাদানশীন।[৩]

(১২) সুমধুর বাচনভঙ্গির অধিকারী ওয়ায়েজ হযরত মাওলানা পীর সৈয়দ জহুর আহমদ শাহ বুখারী কাদেরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ জাহেরী ও বাতেনী সৌন্দর্যে মণ্ডিত ছিলেন। তিনি ছিলেন হাফেযে কুরআন, আলেম, দিওয়ানধারী কবি এবং কাদেরিয়া সিলসিলার শায়খে তরিকত। তিনি ১৩টিরও বেশি কিতাবের রচয়িতা, প্রভাবশালী মুবাল্লিগ এবং আধ্যাত্মিক ফয়েজের আধার ছিলেন। ১৩০৬ হিজরীতে গুজরাট জেলার জালালপুর জাঁটায় তাঁর জন্ম হয় এবং ২২ জুমাদাল উলা ১৩৭২ হিজরীতে তিনি ওফাত লাভ করেন। তাঁর মাজার শরীফ (দরবার-এ-জহুরী) চাকওয়াল জেলার কলার কাহার তহসিলের মানারা শরীফে অবস্থিত।[৪]

(১৩) পীর সুলতান গোলাম সরওয়ার কাদেরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ প্রখ্যাত ওলী হযরত সুলতান বাহু رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ -এর পরিবারের সদস্য ছিলেন। তিনি শায়খ সৈয়দ আলী হায়দার গিলানী বাগদাদীর হাতে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন এবং নানা সুলতান গোলাম নবী কাদেরীর স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। ৪ জুমাদাল উলা ১৪০৮ হিজরীতে রাওয়ালপিন্ডি জেলার গুজর খান তহসিলের মোহড়া থাথালে তাঁর ওফাত হয়।[৫]

---

১ তাযকিরাতুল আনসাব, পৃষ্ঠা: ১৪৩
২ ইতহাফুল আকাবির, পৃষ্ঠা: ৪৬০-৪৬২
৩ খুশাব সারজমিনে আউলিয়া, পৃষ্ঠা: ৩১৪-৩১৭
৪ তাযকিরায়ে আকাবিরে আহলে সুন্নাত, পৃষ্ঠা: ১৯৮-২০০
৫ গুজর খান কে সোহরাওয়ার্দী মাশায়েখ, পৃষ্ঠা: ৩০

ইসলামই কেন?

ইসলাম ও ব্যাক্তিত্বের উৎকর্ষ (১ম পর্ব)

দাওয়াতে ইসলামীর মারকাযি মজলিশে শূরার নিগরান মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী

মানুষের প্রকৃত মর্যাদা ও মূল্য তার শরীর, পোশাক, রূপ-লাবণ্য বা বাহ্যিক জৌলুসে নয়; বরং তার চরিত্র, নৈতিকতা, চিন্তাধারা, অভ্যাস এবং অভ্যন্তরীণ পবিত্রতার মধ্যে নিহিত। পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছেন যারা বাহ্যিক সৌন্দর্যের অধিকারী, কিন্তু তাদের চরিত্রে কোনো আকর্ষণ নেই। অনেকে উচ্চপদে সমাসীন, কিন্তু তাদের সঙ্গ মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। অনেকে জ্ঞান ও সম্পদে সমৃদ্ধ বলে মনে হয়, কিন্তু তাদের অস্তিত্ব থেকে মানবজাতির কোনো কল্যাণ সাধিত হয় না। এর বিপরীতে কিছু মানুষ এমন আছেন, যাদের কাছে হয়তো অর্থ-সম্পদ বা পদ-মর্যাদার চাকচিক্য নেই, কিন্তু তাদের কথায় রয়েছে মাধুর্য, চরিত্রে পবিত্রতা, লেনদেনে সততা, আচরণে সৌজন্য এবং অন্তরে এমন এক নূর বা আলো থাকে যে, তাদের সঙ্গ মানুষকে বদলে দেয়। এমন ব্যক্তিই মূলত চমৎকার 'ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ' (Personal Refinement)-এর অধিকারী। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, ইসলামের এক মহান বৈশিষ্ট্য হলো; এটি মানুষকে কেবল ইবাদতের অনুসারী বানায় না, বরং তাকে একটি সুশৃঙ্খল, ভারসাম্যপূর্ণ, পবিত্র, মর্যাদাবান ও নূরানী ব্যক্তিত্ব দান করে। ইসলাম মানুষের বাহ্যিক রূপের আগে তার অভ্যন্তরীণ জগতকে সুন্দর করে, আমলের আগে নিয়তকে শুদ্ধ করে, জিহ্বার আগে হৃদয়ের সংস্কার করে এবং সমাজ পরিবর্তনের আগে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠন করে। এজন্য ইসলামকে কেবল কয়েকটি আকিদা, ইবাদত ও বিধানের সমষ্টি মনে করা তার ব্যাপকতাকে সীমিত করে ফেলার নামান্তর। ইসলাম মূলত মানুষকে আল্লাহ পাকের নিকটবর্তী করে তাকে সৃষ্টির জন্য অধিকতর উপকারি করে তোলার এক প্রাকৃতিক ব্যবস্থা।

ইসলাম যেভাবে ব্যক্তিত্বকে নিখুঁত করে:

আল্লাহ করীম ইসলামকে এমন এক মহানুভবতা, শ্রেষ্ঠত্ব, পবিত্রতা ও নির্মলতা দান করেছেন যে, যেই কেউ এর ছায়াতলে আসে এবং এর শিক্ষা দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করে, সে নিজেও উৎকর্ষ লাভ করে এবং নিজের চারপাশকেও

আলোকিত করে তোলে। এটি ধ্রুব সত্য যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান যা মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠন করে। ইসলাম মানুষের অভ্যন্তরীণ জগতের সংস্কারের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে; চিন্তাধারাকে পবিত্র করে, নিয়তকে শুদ্ধ করে, চরিত্রকে সুন্দর করে, জিহ্বা ও দৃষ্টিকে আদব শেখায়, লেনদেনে সততা সৃষ্টি করে, রাগকে নিয়ন্ত্রণ, আকাঙ্ক্ষাকে ভারসাম্যপূর্ণ এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে সুআচরণ দান করে। এভাবেই ইসলাম একজন সাধারণ মানুষকে নেককার, ভারসাম্যপূর্ণ ও মর্যাদাবান ব্যক্তিত্বে রূপান্তর করে।

ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষের সূচনাঃ

ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ তখনই শুরু হয় যখন কোনো বান্দা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে ঈমান গ্রহণ করে। অর্থাৎ ইসলামী ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রথম সোপান হলো ঈমান। ঈমান মানুষের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেয়। যখন বান্দা এই বিশ্বাস স্থাপন করে যে, আমি একজন পরম প্রজ্ঞাময় ও দয়ালু রবের বান্দা, আমার জীবন উদ্দেশ্যহীন নয়, আমাকে আমার প্রতিটি কাজের হিসাব দিতে হবে এবং আমার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব বিষয়েই আল্লাহ পাক অবগত আছেন; তখন তার ভেতর এমন এক নৈতিক সতর্কতা সৃষ্টি হয় যার জন্য সব সময় কোনো পুলিশ, আদালত বা ক্যামেরার প্রয়োজন পড়ে না। ফলে সে নির্জনেও বিশ্বাসভঙ্গ করা থেকে বেঁচে থাকে, কারণ সে জানে আমার আল্লাহ আমাকে দেখছেন। একজন প্রকৃত মুসলমান গোপনে গুনাহ করতেও ভয় পায়, কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস যে, দুনিয়ার নজর থেকে লুকিয়ে থাকা সম্ভব হলেও আল্লাহর নজরদারী থেকে কোনোভাবেই বের হওয়া সম্ভব নয়। ঈমানই মানুষের ভেতর আত্মজিজ্ঞাসা সৃষ্টি করে। দুনিয়ায় প্রচলিত ব্যবস্থা মানুষকে অন্যের সামনে ভালো হওয়া বা ভালো সাজার উৎসাহ দেয়, পক্ষান্তরে ইসলাম মানুষকে আল্লাহ পাকের দরবারে ভালো হওয়ার শিক্ষা দেয়। এটিই সেই স্তর যেখান থেকে প্রকৃত ব্যক্তিত্ব গঠন শুরু হয়।

ইসলাম আগে বাতেনকে সুন্দর করেঃ

বাইরে থেকে একজন মানুষকে যতটাই সুন্দর দেখা যাক না কেন, যদি তার অন্তরে অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ, গীবত, আত্মমুগ্ধতা, লোভ এবং লোকদেখানোর মানসিকতা থাকে, তবে সে ভেতর থেকে অসুস্থ। নিশ্চিতভাবে নফসের সংশোধন ব্যক্তিত্বের বিকাশে মেরুদণ্ডের ভূমিকা পালন করে। নফসের এই পবিত্রতা এবং বাতেনের পরিচ্ছন্নতাই মানুষকে ফেরেশতাদের ঈর্ষণীয় করে তোলে; পক্ষান্তরে নফসের কুলষতা মানুষকে মানবতার স্তর থেকে নামিয়ে পশুতে পরিণত করে। ইসলাম ঠিক এই অসুস্থ বাতেনেরই চিকিৎসা করে। একে অভ্যন্তরীণ ব্যাধি থেকে মুক্তি দিয়ে এমনভাবে আলোকিত করে তোলে যে, তাতে আখলাকে মোস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সুঘ্রাণ এবং সীরাতে তায়্যিবার প্রতিফলন ফুটে ওঠে। ইসলাম হিংসার বদলে কল্যাণকামীতা শেখায়; অহংকারের পরিবর্তে বিনয় শেখায়; কৃপণতার বদলে দানশীলতা শেখায়; রাগের বিপরীতে সহনশীলতা শেখায়; কুধারণার বদলে

সুধারণা শেখায়; প্রতিশোধের পরিবর্তে ক্ষমা ও সহনশীলতার উৎসাহ দেয় এবং আত্মমুগ্ধতার বিপরীতে দাসত্বের চেতনা জাগ্রত করে। কুরআনুল কারীম সফল মানুষের বর্ণনা এভাবে দেয়:

قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ زَکّٰىهَا (9) وَ قَدۡ خَابَ مَنۡ دَسّٰىهَا ؕ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেছে, যে তাকে পবিত্র করেছে, এবং নিরাশ হয়েছে যে তাকে পাপের মধ্যে আচ্ছন্ন করেছে।

(পারা: ৩০, আশ-শামস: ৯, ১০)

এ থেকে জানা গেল যে, নিজের নফসকে মন্দ কাজ থেকে পবিত্র করা সফলতা লাভের মাধ্যম এবং নফসকে গুনাহে লিপ্ত করা ব্যর্থতার কারণ। আর নফস মন্দ থেকে তখনই পবিত্র হতে পারে যখন আল্লাহ করীম এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর আনুগত্য করা হয়। এটিই ইসলামের ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ যে, মানুষ নিজের নফসের মালিক হবে, নফসের গোলাম হবে না। কারণ মানুষ যদি ব্যবহারিক চেষ্টা, পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে উত্তম চরিত্র গ্রহণ করে তবে সে মানবতার চরম শিখরে পৌঁছাতে পারে; আর যদি সে হীন চরিত্র ও মন্দ কাজের সমষ্টিতে পরিণত হয় তবে সে মানুষ হিসেবে পরিচয় পাওয়ার অধিকারও হারিয়ে ফেলে।

যাদের ইসলাম নিখুঁত করেছে:

ইসলামই তার অনুসারীদের এমন চমৎকার, পবিত্র ও উচ্চমনা করে গড়ে তোলে যে, একজন মুসলমান নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অন্য মুসলমান ভাইকে নিজের ওপর প্রাধান্য দেয়, এমনকি অনেক সময় তার জন্য নিজের জীবনও উৎসর্গ করে দেয়। যেমন হযরত হুযাইফা رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ বলেন: ইয়ারমুক যুদ্ধে অনেক সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان শহীদ হলেন। আমি হাতে পানি নিয়ে আহতদের মাঝে আমার চাচাতো ভাইকে খুঁজছিলাম। অবশেষে তাকে পেলাম, তিনি অন্তিম মুহূর্তে ছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম: হে চাচাতো ভাই! আপনি কি পানি পান করবেন? তিনি কাঁপাকাঁপা কণ্ঠে খুব ধীরে বললেন: হ্যাঁ। অমনি পাশ থেকে কারো কাতরানোর আওয়াজ শোনা গেল। মুমূর্ষু চাচাতো ভাই ইশারায় বললেন: আগে ওই আহত ব্যক্তিকে পানি পান করান। আমি গিয়ে দেখলাম তিনি ছিলেন হযরত হিশাম বিন আস رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ। তাঁর শ্বাস তখন বন্ধ হয়ে আসছিল আমি তাঁকে পানির কথা জিজ্ঞেস করতেই কাছেই কেউ একজন আহ্ করে উঠলেন। হযরত হিশাম رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ বললেন: আগে তাঁকে পান করান। আমি যখন সেই আহত ব্যক্তির কাছে পৌঁছলাম, তখন তাঁর আর পানি পান করার প্রয়োজন ছিল না; কারণ তিনি শাহাদাতের সুধা পান করে ফেলেছেন। আমি দ্রুত হযরত হিশাম رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর দিকে ফিরে এলাম, কিন্তু তিনিও তখন শহীদ হয়ে গেছেন। এরপর যখন আমার চাচাতো ভাইয়ের কাছে পৌঁছলাম, তিনিও তখন দুনিয়া ত্যাগ করে শহীদ হয়ে গেছেন।[১]

তেমনিভাবে কয়েকজন দরবেশকে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেফতার করা হলো।

---

১ কিমিয়ায়ে-সা'দাত, ২/৬৪৮

সরকারি আদেশ হলো তাঁদের সবাইকে হত্যা করার। যখন হত্যা শুরু হতে যাচ্ছিল, তখন তাঁদের প্রত্যেকেই দাবী করতে লাগলেন যে, আগে আমাকে হত্যা করা হোক, যাতে অন্য ভাই জীবনের এক-দুইটি শ্বাস বেশি নিতে পারে এবং আমি তার আগে প্রাণ দিতে পারি। বাদশা তাঁদের এই ত্যাগ দেখে সবাইকে মুক্তি দিলেন।[১]

যখন কোনো মানুষ ইসলামের দেওয়া মূলনীতি অনুযায়ী নিজের ব্যক্তিত্ব গঠন করে, তখন তার সুফল কেবল তার নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তা তার পরিবার ও পুরো সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এমন ব্যক্তি মানসিক প্রশান্তি, শৃঙ্খলা ও আত্মবিশ্বাস লাভ করে। সুআচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা এবং অধিকার আদায়ের ফলে পরিবারে ভালোবাসা, সহযোগিতা ও স্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়। সামাজিক পর্যায়ে সত্যবাদিতা, আমানতদারী, ক্ষমা ও সুন্দর আচরণের মতো গুণাবলির বদৌলতে পারস্পরিক আস্থা, শান্তি ও সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি হয় যা যেকোনো সভ্য ও উন্নত সমাজের মৌলিক প্রয়োজন। ইসলামের ব্যক্তিত্ব গঠনের এই ব্যবস্থা এতটাই সুসংগঠিত যে, ব্যক্তি থেকে পরিবার এবং পরিবার থেকে পুরো সমাজে এর প্রভাব বিস্তৃত হতে থাকে। এটি তো ইসলামের দেওয়া ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষের একটি ঝলক মাত্র, নতুবা ইসলামের প্রতিটি শিক্ষা নিজের ভেতরে মানুষের ব্যক্তিত্বের কোনো না কোনো দিককে সুন্দর করার উপকরণ ধারণ করে। ঈমান তাকে উদ্দেশ্য দেয়, ইবাদত তাকে শৃঙ্খলা দেয়, তাকওয়া তাকে পবিত্রতা দান করে, চরিত্র তাকে আকর্ষণীয় করে তোলে, লেনদেন তাকে মর্যাদাবান করে এবং সৃষ্টির সেবা তাকে অন্যের জন্য উপকারী করে তোলে। এভাবে ইসলাম মানুষের বাতেন ও জাহের, চিন্তা ও চরিত্র এবং ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনকে এমনভাবে সুন্দর করে যে, তার ব্যক্তিত্ব নিজেও কল্যাণের প্রতীক হয় এবং অন্যদের জন্যও কল্যাণের মাধ্যম হয়ে ওঠে।

১ আখলাকুস সালিহীন, পৃষ্ঠা: ৩৭

ইসলামী বোনদের শরয়ী মাসায়িল

মুফতি আবু মুহাম্মদ আলী আসগর আত্তারী মাদানী

(১) মৃত ব্যক্তির পাশে উচ্চস্বরে কালেমা ও যিকির পাঠের হুকুম?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে কী বলেন যে, আমাদের এখানে যখন মৃতদেহ গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে দেওয়া হয়, তখন মহিলারা সুমধুর কণ্ঠে উচ্চস্বরে কালেমা পাঠ করে। তারা একটি তাসবিহ একশ বার পাঠ করে “খানা কাবা বাইতুল্লাহ মদীনা পাক রাসূলুল্লাহ, ইস রূহ নু বখশিন আপ আল্লাহ”। এটি পাঠ করার পর সেখানে উপস্থিত মহিলারা মিলে বলে “পড়ো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (لَا اِلٰهَ اِلَّا الله)” এবং এরপর কালেমা তৈয়বার যিকির করা হয়। এটি করা কি জায়েয?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

জিজ্ঞাসিত অবস্থায় মৃতব্যক্তির পাশে কালেমা তৈয়বা এবং অন্যান্য যিকির পাঠ করা জায়েয; এতে কোনো অসুবিধা নেই। প্রশ্নে বর্ণিত শব্দাবলী “খানা কাবা বাইতুল্লাহ মদীনা পাক রাসূলুল্লাহ, ইস রূহ নু বখশিন আপ আল্লাহ” সঠিক আছে; এগুলোর মধ্যে শরীয়ত পরিপন্থী কোনো কথা নেই। তবে এ ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন মহিলাদের আওয়াজ পরপুরুষের (না-মাহরাম) কান পর্যন্ত না পৌঁছে। অন্যথায় যদি মহিলাদের আওয়াজ এত উচ্চ হয় যে, পরপুরুষরা তা শুনতে পায়, তবে তাদের এমন উচ্চস্বরে পাঠ করা নাজায়িয ও গুনাহ হবে।

মৃত ব্যক্তির পাশে তাসবিহ ও তাহলীল পাঠ করা সম্পর্কে ‘রদ্দুল মুহতার’-এ আছে: “ولا باس بالتسبيح و التهليل وان رفع صوته” অর্থাৎ

(মৃত ব্যক্তির পাশে) তাসবিহ ও তাহলীল পাঠ করায় কোনো ক্ষতি নেই, যদিও তা উচ্চস্বরে হয়। (রদ্দুল মুহতার, ৩/১০০)

মহিলার আওয়াজও পর্দার অন্তর্ভুক্ত, যেমনটি সায়্যিদী আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনুরূপ একটি প্রশ্নের জবাবে ইরশাদ করেন: "নাজায়িয; কারণ মহিলার আওয়াজও পর্দা এবং মহিলার সুমধুর কণ্ঠ পরপুরুষ শোনা ফিতনার কারণ।"

(ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া, ২২/২৪০)

وَاللهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(২) দুই মাসের গর্ভপাতের পর রক্তস্রাবের শরয়ী হুকুম

প্রশ্ন: ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে কী বলেন যে, হিন্দার দুই মাসের গর্ভপাতের পর মাত্র দশ দিন রক্ত এসেছে, এরপর আর আসেনি। এখন কিছু মহিলা বলছে যে, তার জন্য 'চিল্লা' পূর্ণ করা জরুরী; অর্থাৎ চল্লিশ দিন পর্যন্ত সে নামায, রোযা ও তিলাওয়াত করতে পারবে না। শরয়ী নির্দেশনা প্রদান করুন যে, ওই মহিলাদের কথা সঠিক কি না? এছাড়া ওই মহিলার জন্য হুকুম কী?

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

জিজ্ঞাসিত অবস্থায় ওই মহিলাদের কথা সঠিক নয়; এটি নিছক ভুল ধারণা এবং ইলমে দ্বীন থেকে দূরে থাকার প্রমাণ। হিন্দার জন্য শরয়ী হুকুম হলো; রক্ত বন্ধ হওয়ার পর গোসল করে নামায আদায় করা শুরু করবে। তাকে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বিলম্ব করার বিন্দুমাত্র অনুমতি নেই। যদি সে বিলম্ব করে এবং ফরয নামায আদায় না করে তবে সে গুনাহগার হবে।

মাসয়ালার বিবরণ হলো; ভ্রূণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠিত হওয়ার মেয়াদ চার মাস (প্রায় ১২০ দিন)। যে গর্ভ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (যেমন হাত, পা বা আঙুল ইত্যাদি) গঠিত হওয়ার আগে পড়ে যায় (নষ্ট হয়ে যায়), শরয়ী বিধান অনুযায়ী সেই গর্ভ না হওয়ার সমান গণ্য হবে এবং মহিলাটি 'নিফাস' (সন্তান প্রসব পরবর্তী রক্তস্রাব) ওয়ালী গণ্য হবে না। এমতাবস্থায় এই গর্ভপাতের পর আসা রক্ত যদি 'হায়েয' (ঋতুস্রাব)-এর শর্তানুযায়ী হয় তবে তা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে, অন্যথায় তা 'ইস্তিহাযা' (অসুস্থতাজনিত রক্তস্রাব) হবে।

জিজ্ঞাসিত অবস্থায় যেহেতু দুই মাসের গর্ভপাত হয়েছে যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠিত হয়নি এবং এরপর আসা রক্ত হায়েযের শর্তানুযায়ীও বটে (অর্থাৎ তা কমপক্ষে ১৫ দিন পবিত্র থাকার মেয়াদের পর এসেছে এবং ৩ দিনের বেশি স্থায়ী হয়েছে), তাই এই রক্ত হায়েয হিসেবে গণ্য হবে। যেহেতু এই রক্ত হায়েযের সর্বোচ্চ মেয়াদ (১০ দিন) পূর্ণ করে বন্ধ হয়েছে, তাই রক্ত বন্ধ হওয়ার পর হিন্দা গোসল করে নামায, রোযা ও তিলাওয়াত ইত্যাদির আমল শুরু করবে। (আল-বাহরুর রায়েক, ৪/২৩০; দুররে মুখতার মাআ রাদ্দুল মুহতার, ১/৫৪৯; ফাতাওয়ায়ে রযবেয়া, ২৩/৩৮৩; বাহারে-শরীয়ত, ২/২৩৯)

وَاللهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৩) জুমার প্রথম আযানের পর কেনাবেচার হুকুম

প্রশ্ন: ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতিয়ানে শরীয়ত এ বিষয়ে কী বলেন যে, পুরুষদের জন্য তো জুমার সময় কেনাবেচা করা নাজায়েয, কিন্তু মহিলাদের ওপর তো জুমা ফরয নয়; তাদের জন্য জুমার সময়ে বেচা-কেনা করার হুকুম কী?

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلۡجَوَابُ بِعَوۡنِ الۡمَلِکِ الۡوَھَّابِ اَللّٰھُمَّ ھِدَایَۃَ الۡحَقِّ وَالصَّوَابِ

যাদের ওপর জুমার নামায ফরয, জুমার প্রথম আযান হওয়ার সাথে সাথেই তাদের জন্য নামাযের উদ্দেশ্যে 'সা'য়ী' করা (অর্থাৎ মসজিদের দিকে রওনা হওয়া) ওয়াজিব। এই সময়ে বেচা-কেনা করা এবং প্রতিটি সেই কাজ যা সা'য়ীর পরিপন্থী, তা নাজায়িয ও মাকরূহে তাহরিমী। তবে মহিলা এবং সেই সব ব্যক্তি যাদের ওপর জুমা ফরয নয়, তাদের জন্য এই সময়ে নিজেদের মধ্যে কেনাবেচা করা মাকরূহ নয়।

তবে তাদের (মহিলাদের) জন্য এমন ব্যক্তিদের সাথে বেচা-কানা করা নাজায়িয ও গুনাহ যাদের ওপর জুমা ফরয এবং নিকটস্থ মসজিদে জুমার আযান হয়ে গেছে অথচ তারা এখনও জুমার নামায আদায় করেনি। এর কারণ হলো; যার ওপর জুমা ফরয তার ওপর সা'য়ী ওয়াজিব হয়ে গেছে; এখন সে যদি নামাযের প্রস্তুতি নেওয়ার পরিবর্তে কেনাবেচা করে তবে সে নিষিদ্ধ কাজের লিপ্ত হলো, আর ক্রেতা (মহিলা) তাকে এই কাজে সহায়তা করার কারণে তিনিও গুনাহগার হবেন। (মুখতাসারুল কুদুরী, ১/৪০; দুররে মুখতার মাআ রাদ্দুল মুহতার, ৭/৩০৯, ৩১০; হাশিয়াতুত তহতাভী আলা মারাকিল ফালাহ, ১/৫১৭)

وَاللّٰهُ اَعۡلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوۡلُهٗ اَعۡلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মেয়েদেরকে সময়মতো ঘুমানো ও জাগ্রত হওয়ার শিক্ষা দিন

উম্মে মিলাদ আত্তারীয়া

ঘুম কেবল একটি শারীরিক প্রয়োজন নয়, বরং আল্লাহ পাকের এক বিশেষ রহমত, যার মাধ্যমে মানুষ তার হারানো শক্তি ফিরে পায়, মানসিক ও শারীরিক সতেজতা লাভ করে এবং নতুন দিনের দায়িত্বসমূহ আরও সুন্দরভাবে পালন করার সক্ষমতা অর্জন করে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۷۳﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং তিনি নিজ করুণায় তোমাদের জন্য রাত ও দিন সৃষ্টি করেছেন যেন রাতে আরাম করো এবং দিনে তাঁর অনুগ্রহ তালাশ করো, এবং এজন্য যে, তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।[১]

জীবন ধারণের জন্য যেমন পানাহার ও শ্বাস নেওয়া জরুরী, তেমনি দেহ ও মনকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য পরিমিত ঘুমও অপরিহার্য। সাধারণত এটি প্রতিটি মানুষের জন্যই সমান গুরুত্বপূর্ণ, তবে ক্রমবর্ধমান বয়সী মেয়েদের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব আরও অনেক বেশি বেড়ে যায়। কারণ, এই বয়সটিই হলো শারীরিক গঠন, মানসিক পরিপক্বতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং উত্তম চরিত্র ও অভ্যাস গড়ে ওঠার সময়। সময়মতো ঘুমানো এবং সঠিক সময়ে জাগ্রত হওয়ার অভ্যাস কেবল তাদের স্বাস্থ্যকেই উন্নত করে না, বরং তাদের পড়াশোনা, স্মৃতিশক্তি, মানসিক একাগ্রতা, চটপটে ভাব এবং দৈনন্দিন কাজের ওপরও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

হাদিসে মুবারাকা থেকে জানা যায় যে, সকালের সময়টি বিশেষ বরকতময় সময়। রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোয়া করেছেন: “হে আল্লাহ! আমার উম্মতের ভোরের কাজের মধ্যে বরকত দান করো।”[২] এ কারণেই তিনি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সকালবেলা শুরু করতেন। ওলামায়ে কেরামও এই হাদিসের আলোকে লিখেছেন যে, ইলম অর্জন, ইবাদত, ব্যবসা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য সকালের শুরুটা অত্যন্ত বরকতময়। মুফাসসীরে কুরআন মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه লিখেছেন যে, সাহাবায়ে কেরামও এই সুন্নতের ওপর আমল করে

---

১ পারা: ২০, আল-কাসাস: ৭৩
২ আবু দাউদ, ৩/৫১, হাদিস: ২৬০৬

অনেক উপকৃত হয়েছেন। তিনি আরও বলেন, "আমি নিজেও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি যে, সকালের কাজে অনেক বরকত নিহিত থাকে।"[১]

তাই সময়মতো ঘুমানোর একটি বড় উপকারীতা হলো সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা সহজ হয়। নিয়মিত ফজর নামায আদায় করা, কুরআন তেলাওয়াত, পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়া এবং সারা দিনের কাজে কর্মতৎপরতা লাভ করা এসবই মূলত এই অভ্যাসের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

বর্তমানে অনেক মেয়ে মোবাইল ফোন, সোশ্যাল মিডিয়া এবং অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় ব্যস্ততার কারণে গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকার অভ্যাসে লিপ্ত হয়ে পড়ছে। এই অভ্যাস কেবল তাদের ঘুমকেই ব্যাহত করছে না, বরং তাদের স্বাস্থ্য, পড়াশোনা, নৈতিক চরিত্র এবং দৈনন্দিন শৃঙ্খলার ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। সকালে দেরি করে ওঠার কারণে নামায, পড়াশোনা এবং সাংসারিক কাজগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করে।

অথচ চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও সময়মতো ঘুমানো অসংখ্য উপকার বয়ে আনে। শৈশব এবং কৈশোরে গভীর ঘুম শারীরিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, হাড় মজবুত করে এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করে। পর্যাপ্ত ঘুমের ফলে মানসিক দক্ষতা, স্মৃতিশক্তি এবং শেখার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি মেজাজ ফুরফুরে থাকে এবং আবেগীয় ভারসাম্য বজায় থাকে, ফলে খিটখিটে মেজাজ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। একইভাবে পরিমিত ঘুম হরমোনের ভারসাম্য রক্ষা, ত্বকের সতেজতা, শারীরিক শক্তি এবং দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে উন্নতির কারণ হয়। শৈশব থেকে ঘুমের সুশৃঙ্খল রুটিন ভবিষ্যতে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে সহায়ক প্রমাণিত হয়।

পিতা-মাতা, বিশেষ করে মায়ের দায়িত্ব হলো ঘরে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা যাতে রাতে দ্রুত ঘুমানোর নিয়ম বলবৎ থাকে। বড়রা যদি নিজেরা রাতভর জেগে থাকেন, তবে মেয়েদের মাঝে তাড়াতাড়ি ঘুমানোর অভ্যাস গড়ে তোলা কঠিন হয়ে পড়ে। একইভাবে মেয়েদের ঘুমানোর আগে অযু করা, মাসনুন দোয়া পাঠ করা, আয়াতুল কুরসি এবং অন্যান্য মাসনুন জিকির পাঠ করার অভ্যাস শেখানো উচিত। আরও ভালো হয় যদি আমীরে আহলে সুন্নাতের রিসালা "সওয়াব বাড়ানোর উপায়" থেকে ঘুমানোর সময়ের ভালো ভালো নিয়তগুলোও করিয়ে দেওয়া হয়; যাতে তারা শারীরিক বিশ্রামের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক প্রশান্তিও লাভ করে এবং তাদের ঘুমও সওয়াব অর্জনের কারণ হয়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, সময়মতো ঘুমানো এবং সময়মতো জাগ্রত হওয়া কেবল সাধারণ কোনো অভ্যাস নয়; বরং এটি একটি সুস্থ, সুশৃঙ্খল ও সফল জীবনের ভিত্তি। এই অভ্যাসটিই মেয়েদের দ্বীনি, শিক্ষাগত, পারিবারিক এবং ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবনেও সুখকর প্রভাব ফেলবে। অতএব, পিতা-মাতার উচিত শৈশব থেকেই নিজের মেয়েদের মাঝে এই অনন্য অভ্যাসটি গড়ে তোলা, যাতে তারা দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ করতে পারে।

১ মিরাতুল মানাজিহ, ৫/৪৯১

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল : ০১৭১৪-১১২৭২৬

ঢাকা শাখা : ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

চট্টগ্রাম শাখা : আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৩৫৪০৩৫৮৯

কুমিল্লা শাখা : কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bangladesh@maktabatulmadinah.com, Maktaba Tul Madina Bangladesh